ঝিন্দের বন্দী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ 3
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 13
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 26
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 37
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 43
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 53
সপ্তম পরিচ্ছেদ 77
অষ্টম পরিচ্ছেদ 86
নবম পরিচ্ছেদ 103
দশম পরিচ্ছেদ 123
একাদশ পরিচ্ছেদ 139
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 152
এয়োদশ পরিচ্ছেদ 163

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 175
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 195
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 212
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 228
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 239
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 255
বিংশ পরিচ্ছেদ 266
একবিংশ পরিচ্ছেদ 279
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 297

প্রথম পরিচ্ছেদ

রায়-দেওয়ান

কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে কোনো একটা নামজাদা রাস্তার উপর পদার্পণ করিলেই জমিদার রায় বংশের যে প্রকাণ্ড বাড়িখানা চোখে পড়ে, সেটা প্রায় বিঘা দশেক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আগাগোড়া পাথরে তৈয়ারি দুই-মহল বাড়ি, সম্মুখে মোটা মোটা থামের সিং-দরজা। সিং-দরজার ভিতর দিয়া লাল কঙ্করের চওড়া রাস্তা বাড়ির সম্মুখের গাড়িবারান্দা ঘুরিয়া আবার ফটকের কাছে আসিয়া মিলিয়াছে। বাড়ির দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে জমিদারী সেরেস্তার একটানা ছোট ছোট কুঠুরি ও গাড়ি-মোটর রাখিবার গ্যারাজ ইত্যাদি। বাঁ-দিকে টেনিস খেলিবার ছাঁটা ঘাসের মাঠ ও ব্যায়ামের নানাবিধ সরঞ্জাম। চারিদিকে দেশী বিলাতী ফুলের বাগান এবং সর্বশেষে বসতবাটি ঘিরিয়া ঢালাই লোহার উচ্চ গরাদযুক্ত পাঁচিল।

এই বাড়ির বর্তমান মালিক দুই ভাই, শিবশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর রায়। জ্যেষ্ঠ শিবশঙ্করের বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, ইনি বিবাহিত। প্রত্নতত্ত্বের দিকে খুব ঝোঁক— সর্বদাই লাইব্রেরিতে বসিয়া

পুরাতত্ত্ববিষয়ক বই পড়েন, কিম্বা নিজের বংশের পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অবরোধ সম্বন্ধে কয়েকটা নূতন কথা আবিষ্কার করিয়া গুণীসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ছোট ভাই গৌরীশঙ্করের মনের গতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইলেও খেলাধুলা, ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকের দিকেই তাঁহার আকর্ষণ বেশী, দাদার মত বই মুখে দিয়া পড়িয়া থাকিতে কিম্বা পুরাতন দলিল ঘাঁটিয়া পিতৃপিতামহের দুষ্কৃতির নজির বাহির করিতে তিনি ব্যগ্র নন। গৌরীশঙ্কর অদ্যাপি অবিবাহিত, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়— অতিশয় সুপুরুষ। রায়বংশ ডাকসাইটে সুপুরুষ বলিয়া পরিচিত; গৌরীশঙ্কর যে তাহার ব্যতিক্রম নয় তাহা তাঁহার গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আর সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু ইঁহাদের কথা পরে হইবে। প্রথমে এই রায় বংশের গোড়ার কথাটা বলিয়া লওয়া যাউক।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বংশের উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ কালীশঙ্কর রায় হঠাৎ একদিন পাঁচখানা বজরা সহযোগে আদিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং কালীঘাটে মহাসমারোহে সোপচারে পূজা দিলেন। অতঃপর অল্পকালের মধ্যে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলে এক মস্ত জমিদারী কিনিয়া ফেলিলেন এবং কলিকাতার সন্নিকটে মাঠের মাঝখানে এক ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া রায়-দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় উপাধি ধারণ করিয়া মহা ধুমধামের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোথা হইতে

আসিলেন কেহ জানিল না; কিন্তু সেজন্য সমাজে তাঁহার গতি প্রতিহত হইল না। যাহার টাকা আছে তাহার দ্বারা সকলই সম্ভব; বিশেষ কালীশঙ্কর বহু দেশ পর্যটন করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি তৎকালিক কলিকাতার বরেণ্য সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার শতাব্দীপূর্বের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, রায়-দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপর্যাপ্তভাবে ছড়ানো আছে।

কিন্তু এতবড় লোকের বংশরক্ষার দিকেও নজর রাখিতে হয়। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গেলেও কালীশঙ্কর অতিশয় সুপুরুষ ও মজবুত লোক ছিলেন; সুতরাং তিনি অবিলম্বে সদ্বংশজাতা একটি স্ত্রী গ্রহণ করিয়া একযোগে সংসার ধর্মও পারলৌকিক ইষ্টের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

রায়-দেওয়ানকে কিন্তু স্ত্রী ও সাংসারিক সুখৈশ্বর্য বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না।

বছর পাঁচেক পরে একদিন রাত্রিকালে কোনো ধনী বন্ধুর বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার পথে নিজের সিং-দরজার প্রায় সম্মুখে রায়-দেওয়ান খুন হইলেন। তিনি পালকি চড়িয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে হুঁকাবরদার ও দুইজন মশাচি ছিল। নির্জন রাত্রি, হঠাৎ চারজন অস্ত্রধারী দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পালকির বেহারা উড়িয়াগণ পালকি ফেলিয়া দৌড় মারিল। হুঁকাবরদার ও মশালচিদ্বয়ও বোধ করি উড়িয়াদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরে তাহা স্বীকার করিল না। বরঞ্চ প্রভুর রক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত কিরূপ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ নিজ নিজ

দেহে বহু দাগ ও ক্ষতচিহ্ন দেখাইল। সে যাহা হউক, দেউড়ি হইতে লোকজন আসিয়া যখন রায়-দেওয়ানকে পালকি হইতে বাহির করিল, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, শুধু একটা ছোরার সোনালী মুঠ বুকের উপর উঁচু হইয়া আছে।

কলিকাতায় কোম্পানীর শাসন তখন খুব দৃঢ় হয় নাই। এরকম খুনজখম লুটতরাজ প্রায়ই শুনা। যাইত। কলিকাতা শহর তখন অর্ধেক জঙ্গল বলিলেই চলে; দিনের বেলা চৌরঙ্গীর আশেপাশে বাঘের ডাক শুনা যাইত। সুতরাং কাহারা রায়-দেওয়ানকে খুন করিল এবং কেনই বা করিল তাহার কোন কিনারা হইল না। উপরন্তু রায়-দেওয়ানের অঙ্গস্থিত হীরার আংটি, সোনার চেন কিছুই খোয়া যায় নাই দেখিয়া আততায়ীদের এই অহেতুক জীবহিংসায় সকলের মনেই একটা ধাঁধার ভাব রহিয়া গেল।

শুধু অনেক অনুসন্ধানের পর হুঁকা বরদারের নিকট হইতে এইটুকু জানা গেল যে, হত্যাকারীরা এদেশীয় লোক নয়; তবে তাহারা যে কোন্ দেশের লোক তাহাও সে বলিতে পারিল না। কারণ হত্যা করিবার পূর্বে যে ভাষায় তাহারা রায়-দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এ ছাড়া প্রমাণের মধ্যে সেই সোনার মুঠ-যুক্ত বাঁকা ইস্পাতের ছুরিখানা। ছুরিখানার গঠন এতই অদ্ভুত যে তাহা বাংলা দেশের তৈয়ার বলিয়া মনে হয় না। তাহার সোনার মুঠের উপর যে দুই-চারিটা অক্ষর খোদাই করা ছিল, আজ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারে নাই।

এই সমস্ত প্রমাণ সাক্ষীসাবুদ একত্র করিয়া কেবল এইটুকুই অনুমান করা গেল যে, দেশ-বিদেশে পরিক্রমণের সময় কালীশঙ্কর হয়তো কোনো শক্তিশালী লোকের শত্রুতা করিয়াছিলেন— তাহারি অনুচরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এছাড়া এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো দিক দিয়া আর কিছু জানা গেল না।

ইহাই বলিতে গেলে রায়-বংশের আদিপর্ব। তারপর কি করিয়া কালীশঙ্করের স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র কোলে লইয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারী শাসন করিয়া অচিরাৎ রায়বাঘিনী উপাধি অর্জন করিলেন এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত রায়-পরিবার কি করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব ও বংশগরিমা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সে সব কথা লিখিয়া গ্রন্থ ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। রায় বংশের ইতিহাস এইখানেই চাপা থাকুক। পরে প্রয়োজন হইলে এই ছেঁড়া পুঁথির পাতা আবার খুলিলেই চলিবে।

সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরি ঘরে বিদ্যুত্বাতি জ্বালিয়া একাকী বসিয়া একখানা মোটা চামড়া বাঁধানো পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। ঘরের দেয়ালগুলা অধিকাংশই মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত পুস্তকের আলমারি দিয়া ঢাকা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা— চলিতে ফিরিতে শব্দ হয় না। ঘরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেল, তাহার চারিপাশে কতকগুলি গদি-মোড়া চেয়ার। ঘরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখের দেয়ালে একখানা তৈলচিত্র টাঙানো দেখা যায় এটি বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কালীশঙ্করের প্রতিকৃতি। প্রমাণ মানুষের ছবি—মাথায় পাগড়ি ও গায়ে ঘুন্টিদার মেরজাই পরা; মুখচোখ বুদ্ধির প্রভায় যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। দেড়শত বৎসরের পুরাতন হইলেও ছবিখানি এখনো বেশ ভাল অবস্থায় আছে—দাগ ধরিয়া বা পোকায় কাটিয়া নষ্ট হয় নাই।

শিবশঙ্কর একমনে পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী অচলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেশ একটু শব্দ করিয়া পাশের একখানা চেয়ারে বসিলেন। প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে উনিশ বছরের বধূটি একেবারে একা-বাড়িতে দাসী চাকরানী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক নাই। তাই দিনের বেলাটা কাজে কর্মে যদি বা কোনোমতে কাটিয়া যায়, সন্ধ্যার পর স্বামী লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলে আর যেন সময় কাটিতে চাহে না। দেবর গৌরীশঙ্করও কয়েকদিন ধরিয়া কি একটা খেলায় এমন মাতিয়াছেন যে, দুদণ্ড বসিয়া গল্প করা তো দূরের কথা, তাঁহার দর্শন পাওয়াই ভার হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দ শুনিয়া শিবশঙ্কর বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং স্ত্রীর দিকে ফিকা রকম একটু হাসিয়া আবার পুস্তকে মনোনিবেশের উদ্যোগ করিলেন।

অচলা নিজের চেয়ারখানা স্বামীর দিকে একটু টানিয়া আনিয়া বলিল— বই রাখো। এস না একটু গল্প করি।

শিবশঙ্কর চমকিত হইয়া বলিলেন— অ্যাঁ। ওঃ– হ্যাঁ, বেশ তো। তা গৌরী কোথায়?

অচলা হাসিয়া বলিল— ঠাকুরপো এখনো ক্লাব থেকে ফেরেনি। ভারি মুষড়ে গেলে–না? ঠাকুরপো থাকলে আমাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বই পড়তে পারতে।

শিবশঙ্করও হাসিয়া ফেলিলেন–না না, তা নয়। তাকে কদিন দেখিনি কিনা তাই ভাবছিলুম, সেবারকার মত লক্ষ্ণৌ কি লাহোর পাড়ি দিল বুঝি।

অচলা বলিল–তোমাকে না বলে তোমার অনুমতি না নিয়ে তো ঠাকুরপো কোথাও যায় না।

তা বটে!–শিবশঙ্কর একটু হাসিলেন— আজকাল বুঝি তলোয়ার খেলায় মেতেছে? গোয়ালিয়র না যোধপুর থেকে একজন বড় তলোয়ার খেলোয়াড় এসেছে, তারই কাছে দেশী তলোয়ার খেলা শেখা হচ্ছে। এই তো মাস কয়েক আগে কোন একটা ইটালিয়ানকে মাইনে দিয়ে রেখে ফেন্সিং শিখছিল। তার আগে কিছুদিন বক্সিং-এর পালা গেছে। এবার গোয়ালিয়র ঘাড় থেকে নামলে আবার কি চাপে দেখ।

অচলা বলল–সত্যি বাপু, সময়ে বিয়ে না দিলে আজকালকার ছেলেরা কেমন একরকম হয়ে যায়। তুমিও তো কিছু করবে না, কেবল বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকবে। ঠাকুরপোর বৌ এলে আমার কত সুবিধে হয় ভাব দেখি? একলাটি এত বড় সংসারে কি মন লাগে?

শিবশঙ্কর মৃদুহাস্যে বলিলেন— সেইটেই তাহলে আসল কথা! কিন্তু কি করি বল, বিয়ের কথা তুললেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

অচলা বলিল— তাই বলে সারা জন্ম কি কুস্তি করে আর তলোয়ার খেলে কাটাবে নাকি? বিয়ে-থা সংসারধর্ম করতে হবে না?

বাহিরের গাড়িবারান্দায় মোটরের গুঞ্জন শব্দ শোনা গেল। শিবশঙ্কর বলিলেন— প্রশ্নটা ওকেই করে দেখ। ওই বুঝি সে এল!

হাফ-প্যান্ট-পরা কামিজের গলা খোলা গৌরীশঙ্কর সেই ঘরেই আসিয়া প্রবেশ করিল। অচলাকে দেখিয়া বলিল–ইস্, অচলবৌদি একেবারে দাদার ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছ যে। এবারে দেখছি দাদাকে লাইব্রেরির দোরে শান্ত্রী বসাতে হবে।

অচলা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল–তুমি আমাকে অচলবৌদি বলবে কেন বল তো? শুধু বৌদি বলতে পার না?

গৌরী বলিল— বৌদি হিসাবে তুমি যে একেবারেই অচল এইটি পাঁচজনকে জানানোই আমার উদ্দেশ্য— এ ছাড়া অন্য অভিপ্রায় নেই।

শিবশঙ্কর বলিলেন–আজকাল তো তবু খাতির করে অচলবৌদি বলছে, বছর চারেক আগে পর্যন্ত যে শুধু অচল বলেই ডাকত!

বস্তুত অচলা এ সংসারে আসিয়া অবধি এই দুইটি কিশোর-কিশোরীর মধ্যে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সরস সম্পর্কের সহিত ভাই-বোনের মধুর স্নেহ মিশিয়াছিল। অচলা ঠোঁট

ফুলাইয়া বলিল— বেশ তো, আমি যদি এতই অচল হয়ে থাকি, একটি সচল বৌদি ঘরে নিয়ে এস, আমি না হয় এক কোণে পড়ে থাকব।

গৌরী হাসিয়া বলিল— ওরে বাস রে, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! দাদাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে সেই কোণেই আশ্রয় নিতে হবে যে।

অচলা হাসিয়া ফেলিল, বলিল— সে যেন হল। কিন্তু আজ তিন জন ঘটক এসেছিল যে!

গৌরী বলিল— আবার ঘটক! দারোয়ানগুলোকে তাড়াতে হল দেখছি। তাদের পৈ পৈ করে বলে দিয়েছি, ঘটক দেখলেই অর্ধচন্দ্র দেবে, তা হতভাগারা কথা শোনে না!

এই সময় বেয়ারা দরজার বাহির হইতে জানাইল, একটি ভদ্রলোক মূলাকাৎ করিতে চাহেন, হুকুম পাইলে সে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসে।

গৌরী বলিল— এই সেরেছে— ঘটক নিশ্চয়। আমাকে পালাতে হল; দাদা, তুমি লোকটাকে ভালয় ভালয় বিদেয় করে দাও।

খবরদার বলছি, ঘটক তাড়াতে পারবে না। বাড়িতে সোমত্ত আইবুড় ছেলে, ঘটক আসবে না তো কি? বলিয়া অচলা হাসিতে হাসিতে ভিতরের দরজা দিয়া প্রস্থান করিল।

গৌরীও অচলার অনুগমন করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন— পালাস্ নে, বস। হুকুম শুনলি তো?

গৌরী টেবলের একটা কোণে বসিয়া বলিল— নাঃ, এরা আর বাড়িতে টিকতে দিলে না। এবার লম্বা পাড়ি জমাতে হবে দেখছি—একেবারে কাশ্মীর, না হয় আরাকান।

শিবশঙ্কর আগন্তুক ডাকিয়া আনিবার জন্য বেয়ারাকে হুকুম দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধনঞ্জয়

কিছুক্ষণ পরে যে লোকটি পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল তাহাকে কিন্তু বাংলা দেশের ঘটক সম্প্রদায়ভুক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। লোকটি বাঙালী নয়, তবে কোন্ জাতীয় তাহা চেহারা বা বেশভূষা দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। মাথায় মাড়োয়ারী ধরনের খুনখারাবী রঙের পাগড়ি, গায়ে দামী সিল্কের সেকেলে ধরনের পুরা আস্তিন আত্রাখা, পরিধানে বারাণসী চেলী, পায়ে লাল মখমলের উপর সাঁচ্চার কাজ করা নাগরা। গলায় সরু সোনার শিকলি দিয়া আটকানো একটা মোহর—তাহার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পান্না ঝকঝক করিতেছে। দুই কানে দুইটি সুপারির মত রুবি হইতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোঁফ কাঁচাপাকা। গায়ের বর্ণ নিকষের মত কালো। কিন্তু কি অপূর্ব দেহের ও মুখের গঠন! যেন হাতুড়ি দিয়া লোহা পিটিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। ঘন ভুর নীচে চক্ষু দুটা ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো।

।লোকটি ঘরে ঢুকিয়াই দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দৃষ্টি দেয়ালে টাঙানো কালীশঙ্করের তৈলচিত্রটার উপর নিবদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া বিশুদ্ধ বজ্রবুলিতে জিজ্ঞাসা করিল— এ ছবি এখানে কি করে এল?

আগন্তুকের অদ্ভুত বেশভুষা দেখিয়া দুই ভাই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, এইবার গৌরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল— মাপ করবেন। আমার ব্যবহারে আপনারা কিছু আশ্চর্য হয়েছেন। আমি এখনি নিজের পরিচয় দেব; কিন্তু তার আগে ইনি কে জানতে পারি কি?

গৌরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল— উনি আমাদের পূর্বপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্কর রায়।

কালীশঙ্কর রাও!—লোকটির দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল; তারপর বলিল— বসতে পারি কি?

গৌরী স্বহস্তে একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—বসুন।

লোকটি উপবেশন করিয়া বলিল— বাবুসাব, সমস্তই নিয়তির খেলা। তা না হলে নিতান্ত অপরিচিত আমি, আমি দেওয়ান কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধরদের সঙ্গে কথা কইছি কি করে?

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল—এ আর আশ্চর্য কি? কালীশঙ্কর রায়ের বংশধরদের সঙ্গে অনেকেই তো কথা কয়ে থাকেন।

লোকটি বলিল— তা নয়। আপনি এখন আমার কথা বুঝবেন না। — আচ্ছা, আপনারা কখনো ঝি দেশের নাম শুনেছেন কি?

গৌরী স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—— ঝি! ঝিন্! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে—

শিবশঙ্কর বলিলেন–ঝি মধ্যভারতের একটা ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য। দাঁড়ান বলছি। তিনি উঠিয়া একটা আলমারি হইতে একখণ্ড মোটা বই বাহির করিয়া সেটার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে আসিয়া থামিলেন। বলিলেন—এই যে ঝি-ঝড়োয়া। মধ্যভারতেরই বটে। স্বাধীন— ইংরাজের মিত্ররাজ্য। ঝিন্ এবং ঝড়োয়া দুটি পাশাপাশি যুগ্ম রাজ্য। পার্বত্য দেশ–একটি নদী আছে, নাম কিস্তা (সম্ভবত কৃষ্ণতোয়ার অপভ্রংশ), ঝিন্দের আয়তন– ১৫৫৪ বর্গ মাইল, রাজধানী সিংগড়। ঝড়োয়ার আয়তন ১৪৮৫ বর্গ মাইল; রাজধানী— বেতপুর। সর্বসুদ্ধ জনসংখ্যা ১১৮৯৫৩; প্রধান উপজীব্য শিল্প; খনিজ সম্পত্তি প্রচুর। দুই রাজ্যেই হিন্দু রাজা।

আগন্তুক বলিল— হ্যাঁ, ঐ ঝিন্দ-ঝড়োয়া। এইবার আমার পরিচয় দিই— আমি ঝিন্দের একজন ফৌজী-সদার— আমার নাম সর্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। ঝিন্দের রাজার আমরা বংশানুক্রমিক পার্শ্বচর।

শিবশঙ্কর শিষ্টতা দেখাইয়া বলিলেন–আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঝিন্দের ফৌজী-সদারের কি প্রয়োজন থাকতে পারে, সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছি না।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বলিলেন—বাবুসাব, কিছুক্ষণ আগে ঐ ছবিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আপনারা কিছু আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাদের এমন একটা কাহিনী বলতে পারি যা শুনে আপনারা আরো আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আপনাদের এই পূর্বপুরুষটির যে অদ্ভুত জীবন বৃত্তান্ত আমি জানি, তার শতাংশের একাংশও আপনারা জানেন না। কিন্তু সে-কথা এখন নয়; যদি কখনো সময় পাই বলব। এখন আমার প্রয়োজনের কথাটাই বলি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী আবার আরম্ভ করিলেন—আপনারা যে দুই ভাই তা আমি ইতিপূর্বেই আপনাদের বেয়ারার কাছে জেনেছি, তাই যে-কথা আজ শুধু একজনকে বলব বলেই। এসেছিলাম তা আপনাদের দুজনকেই বলছি। আশা করি, আমাদের কথাবার্তা অন্য কেউ শুনতে পাবে না।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রীর কথার ভঙ্গিতে দুইজনেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; গৌরী উঠিয়া গিয়া ঘরের দ্বারগুলা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। বলিলএবার বলুন; আর কারুর শোনবার সম্ভাবনা নেই।

ধনঞ্জয় বলিলেন— আর এক কথা। আপনারা আমার প্রস্তাবে রাজী হন বা না হন, আমার কথা ঘুণাক্ষরে কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারব না।

দুইজনেই প্রতিশ্রুত হইলেন।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন দেখুন, ঝিন্দঝড়োয়া রাজ্য দুটি বরোদা বা হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য নয়। ইতিহাসে এবং ভূগোলে তাদের নাম ছোট করেই লেখা আছে— তাই ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও অনেকে ঝি-ঝড়োয়ার নাম জানে না। কিন্তু ছোট হলেও তারা একেবারে নগণ্য নয়। সেখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি আছে, ভারত সম্রাটের দরবারে এই দুই রাজ্যের রাজার একটা নির্দিষ্ট আসন আছে।

আপনারা ঝিন্দ-ঝড়োয়ার সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই এর পূর্বতন ইতিহাস কিছু বলা দরকার। ভারতবর্ষের হুণ অভিযানের কথা আপনারা পড়েছেন। সেই সময় মথুরার যুবরাজ স্মরজিৎ সিংহ। এবং তাঁর ভগিনীপতি বেত্রবর্মা হুণ কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দক্ষিণাপথে সপরিবারে পালাতে পালাতে তাঁরা এক দুর্গম পর্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। স্থানটি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে এমনভাবে সুরক্ষিত যে স্মরজিৎ সিংহ তাঁর দক্ষিণ যাত্রা এখানেই নিরুদ্ধ করলেন এবং সেখানকার আটবিক বন্য জাতিকে বাহুবলে পরাস্ত করে এই ঝি-রাজ্য স্থাপন করলেন। অতঃপর ভগিনীপতি বেত্রবর্মার সঙ্গে মনের মিল না হওয়াতে দুজনে রাজ্য সমান ভাগ করে নিলেন। পৃথক

হয়ে বেত্রবর্মা তাঁর রাজ্যের নাম রাখলেন ঝড়োয়া। দুই রাজ্যের মাঝখানে পার্বত্য নদী কৃষ্ণতোয়া সীমানা রক্ষা করছে।

সেই অবধি এই দুই রাজবংশ ঝি ও ঝড়োয়ায় রাজত্ব করে আসছে। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। নিয়তির শত শত ঝড় বয়ে গেছে পাঠান, মোগল, ইরাণী, মারাঠী, ইংরেজ হিন্দুস্থানকে নিয়ে টানাটানি হেঁছেড়ি করেছে, কিন্তু ঝিন্দঝড়োয়া তার দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, কখনো তার গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি। একে অনুর্বর পাহাড়ে দেশ, তার ওপর বাহিরের কলহে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাই কোনোদিন কোনো শক্তিশালী জাতির লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর পড়েনি।

এই তো গেল অতীতের কাহিনী। বর্তমানের কথা সংক্ষেপে বলছি। বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, ঝিন্দের মহারাজ ভাস্কর সিংহ আজ ছমাস হল গতাসু হয়েছেন। মহারাজ ভাস্কর সিংহের দুই পুত্র কুমার শঙ্কর সিংহ ও কুমার উদিত সিংহ। কুমার শঙ্কর স্বর্গীয়া পাটরানী রুক্মা দেবীর গর্ভজাত, আর কুমার উদিত স্বর্গীয়া দ্বিতীয়া মহিষী লখিমা দেবীর গর্ভজাত। দুজনের বয়স সমান, শুধু কুমার শঙ্কর উদিতের চেয়ে ঘণ্টাখানেকের বড়। সুতরাং তিনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।

এইখানেই গণ্ডগোলের আরম্ভ। বাপের মৃত্যুর পর উদিত সিংহ ছোট হয়েও গদীতে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঝিন্দের সিংহাসন যে ন্যায়ত তাঁরই, এ কথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি তাঁর জন্মকালীন ধাত্রী, ডাক্তার প্রভৃতিকে সাক্ষী করে দাঁড় করালেন; কিন্তু দেশের লোক তাঁকে চায় না, তারা চায় কুমার শঙ্কর সিংকে। তার একটা কারণ,

মাতাল লম্পট হলেও কুমার শঙ্করের প্রাণটা ভারি দরাজ, আর উদিত সিং দুর্দান্ত অত্যাচারী। এত বড় কুরপ্রকৃতি স্বার্থপর ভোগবিলাসী লোক খুব কম দেখা যায়।

দেশে নিজের পরিপোষক না পেয়ে উদিত সিং গোপনে গোপনে ইংরাজ গভর্নমেন্টকে নিজের দাবি জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ভারত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করলেন না; দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানালেন। ওদিকে সুবিধা করতে না পেরে কুমার উদিত অন্য রাস্তা ধরলেন।

এদিকে কুমার শঙ্করের অভিষেকের আয়োজন হতে লাগল। সমস্ত ঠিক, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কাছ থেকে রাজকীয় অভিনন্দন পত্র পর্যন্ত এসে উপস্থিত —এমন সময় এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটল; যখন অভিষেকের আর দশদিন মাত্র বাকি, তখন কুমার শঙ্কর সিং নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে একজন আমাণী ব্যবসাদারের সুন্দরী স্ত্রীকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

অভিষেক পিছিয়ে গেল। তারপর মাসখানেক পরে যুবরাজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

আবার অভিষেকের দিন স্থির হল এবং এবারও নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ আগে কুমার হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন। এবার তাঁর সঙ্গিনী একটি বিবাহিতা কাশ্মীরী সুন্দরী।

বারবার দুবার এই রকম বিশ্রী কাণ্ড দেখে দেশসুদ্ধ লোক কুমার শঙ্করের ওপর চটে গেল। ইংরাজ গভর্নমেন্টও জানালেন যে, ভবিষ্যতে যদি ফের এইরূপ হাস্যকর অভিনয় হয়, তাহলে তাঁরা কুমার উদিতের দাবি গ্রাহ্য করে তাঁকেই সিংহাসনে বসাবেন।

আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, এ সমস্ত কুমার উদিতের কারসাজি। সোজাপথে বিফল হয়ে তিনি চেষ্টা করছেন–বড় রাজকুমারকে দায়িত্বশূন্য অপদার্থ প্রতিপন্ন করে নিজের দাবি পাকা করতে। সত্য বলতে কি, কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছেন। এরই মধ্যে দেশে একদল লোক দাঁড়িয়েছে, যারা উদিত রাজা হলেই বেশী খুশি হয়।

আমাদের মত যারা ন্যায্য অধিকারীকে সিংহাসনে বসাতে চায়, তাদের অবস্থা একবার ভেবে। দেখুন। একদিকে উজ্জ্বল রাজকুমার—সরল, সাহসী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, কিছুতেই পরোয়া নেই অপরদিকে কূটচক্রী রাজ্যলোলুপ তাঁর ছোট ভাই। বাবুসাব, আমি ঝিন্দের রাজপরিবারের বংশগত ভৃত্য, বৃদ্ধ মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন, যেন কুমার শঙ্করকে গদীতে বসাই। মুমূর্ষ রাজার সে হুকুম আমি ভুলিনি। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে পারি শঙ্কর সিংকে সিংহাসনে বসাব।

তাই, বৃদ্ধ দেওয়ান বজ্রপাণির সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ বার রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির করলাম। আগামী ২৩শে আশ্বিন হচ্ছে সেইদিন, অর্থাৎ আজ থেকে সাত দিন মাত্র বাকি। দিন স্থির করে যুবরাজের মহালের চারিদিকে পাহারা বসালাম। জেলখানার কয়েদীকেও বোধ হয় এত সতর্কভাবে পাহারা দিতে হয় না। মহালের মধ্যে তিনি যখন

যেখানে যান সঙ্গে লোক থাকে, বাইরে যেতে চাইলে দশজন সওয়ার নিয়ে আমি সঙ্গে থাকি।

যুবরাজ প্রথমটা কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু ক্রমে আমাকে ডেকে নানারকম ভর্ৎসনা তিরস্কার আরম্ভ করে দিলেন। আমি অটল হয়ে রইলাম, বললাম— যুবরাজ, তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে মুক্তি দেব, তার আগে নয়। তিনি আমাকে অনেক আশ্বাস দিলেন যে, এবার কিছুতেই রাজ্য ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু আমি তাঁর দুর্বল চিত্ত জানতাম, কিছুতেই রাজী হলাম না।

এই সময় কুমার উদিত একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন; দুইভায়ে বাহিরে বেশ সৌহার্দ্য ছিল— তার কারণ আপনারা বুঝতেই পারছেন; সুন্দরী স্ত্রীলোকের লোভ দেখিয়ে উদিত বড় ভাইকে বশ করে রেখেছিলেন। স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে উদিত তাঁকে ব্যভিচারের পথে নিয়ে যাচ্ছে, একথা গোঁয়ার শঙ্কর সিং বুঝেও বুঝতেন না।

উদিতকে আসতে দেখে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেলাম। দুইভায়ে কি কথা হল জানি না; কিন্তু উদিত চলে যাবার পরই আমি প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম এবং স্বয়ং রাজকুমারের ঘরের দরজায় পাহারা দেব স্থির করলাম।

কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখা গেল না—পরদিন সকালে দেখলাম পাখি উড়েছে। কিস্তার জলে নৌকার বন্দোবস্ত ছিল, কুমার শোবার ঘরের জানালা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে, সেই নৌকায় চড়ে অন্তহিত হয়েছেন।

এবার আর ব্যাপারটা জানাজানি হতে দিলাম না। পাহারা যেমন ছিল তেমনই রইল। মহালে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—এই হুকুম জারি করে দিয়ে আমি যুবরাজকে খুঁজতে বেরুলাম। দুদিন সন্ধান করবার পর খবর পেলাম যে, তিনি কলকাতায় এসেছেন।

তখন আমার অধীনস্থ একজন বিশ্বস্ত সেনানী সর্দার রুদ্ররূপকে আমার জায়গায় বসিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রাজ্যে রটিয়ে দেওয়া হল যে, কুমারের শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

আজ দুদিন হল আমি কলকাতায় এসেছি। এসে পর্যন্ত চারিদিকে কুমারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না। এতবড় শহরে একজন লোককে খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়, এদিকে অভিষেকের দিনও ক্রমে এগিয়ে আসছে।

কুমার শঙ্কর খুব মিশুক লোক, তাই এ শহরে যত বড় বড় ক্লাব আছে, সেইসব ক্লাবে কুমারের খোঁজ নিলাম, তারপর বড় বড় হোটেলে তল্লাস করলাম কিন্তু কোথাও কোনো ফল পেলাম না। বুক দমে গেল। তবে কি মিথ্যা খবর পেয়ে এতদূর ছুটে এলাম! যুবরাজ কি এখানে আসেননি?

আজ বৈকাল বেলা নিতান্ত হতাশ হয়েই একটা ট্যাক্সিতে চড়ে আপনাদের এই লেকের চারধারে ঘুরছিলাম আর ভাবছিলাম, এখন কি করা যায়? এমন সময়ে হঠাৎ আমার নজর পড়ল, একটি যুবাপুরুষ একখানা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে মোটর থেকে নামছেন।

এই পর্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় চুপ করিলেন, তারপর গৌরীশঙ্করের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—সে যুবাপুরুষটি আপনি?

শ্রোতৃযুগল এতক্ষণ তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছিলেন, চমক ভাঙ্গিয়া গৌরী বলিল— ক্লাবের সামনে আমাকে নামতে দেখে থাকবেন।

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন— হ্যাঁ, ক্লাবের সামনেই বটে। আপনাকে দেখে আমি প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, তারপর এক লাফে ট্যাক্সি থেকে নেমে আপনার অনুসরণ করলাম।

আপনি তখন ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আমি দারোয়ানকে বললাম— কুমার শঙ্কর সিংহের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই— তাঁকে খবর দাও।

দারোয়ান বললে–শঙ্কর সিং বলে কাউকে সে চেনে না। আমি একটা তাড়া দিয়ে বললাম— এইমাত্র যিনি এ বাড়িতে ঢুকলেন তিনিই শঙ্কর সিং— শীঘ্র আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

দারোয়ানটা হেসে বললে— আপনি ভুল করছেন; যিনি এইমাত্র এলেন তাঁর নাম জমিদার বাবু গৌরীশঙ্কর রায়।

আমি বললাম-কখনই না। তিনি শঙ্কর সিং-আমি স্বচক্ষে তাঁকে এখানে ঢুকতে দেখেছি। দারোয়ান বললে—হুজুর, বিশ্বাস না হয় সেক্রেটারি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। বলে আমাকে সেক্রেটারির ঘরে নিয়ে গেল।

সেক্রেটারিবাবুটি অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার কথা শুনে বললেন–শঙ্কর সিং বলে ক্লাবের কোনো সভ্য নেই, তবে কোনো সভ্যের বন্ধু হিসাবে ক্লাবে এসে থাকতে পারেন। বিশেষত আজ ক্লাবে তলোয়ার খেলার একটা প্রদর্শনী আছে— তাই বাইরের লোকও অনেক এসেছেন। এই বলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে গেলেন। একটি হলে অনেক লোক জমা হয়েছিল এবং তারই মাঝখানে তলোয়ার খেলা চলছিল। সেক্রেটারিবাবু আমাকে বললেন দেখুন দেখি, আপনার শঙ্কর সিং এখানে আছেন কি না।

প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পেরেছিলাম, যে দুজন লোক তলোয়ার খেলছেন, শঙ্কর সিং তাঁদেরি একজন। আমি আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম—ঐ শঙ্কর সিং।

সেক্রেটারিবাবু হেসে উঠলেন— আপনি ভুল করেছেন। উনি গৌরীশঙ্কর রায়, আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এও কি সম্ভব! পৃথিবীতে দুজন লোকের কি এক রকম চেহারা হয়? না—এরা সকলে মিলে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে?

গৌরীশঙ্কর আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধনঞ্জয় তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন— ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন? অমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি, এ যে হতে পারে তা কখনো কল্পনা করিনি। আপনার শরীরে এমন কোনো স্থান নেই যা অবিকল শঙ্কর সিংয়ের মত নয়। এমন কি আপনার গলার আওয়াজ পর্যন্ত হুবহু তাঁর মত। সৃষ্টির এ যেন এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! অন্তত তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের এই ঘরে ঢুকে আমার মনে হচ্ছে যেন সে প্রহেলিকার উত্তর পেয়েছি। বলিয়া তিনি দেয়ালে লম্বিত কালীশঙ্করের ছবিখানার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর দুইভায়ের বুক হইতে বহুক্ষণের নিরুদ্ধ নিশ্বাস সশব্দে বাহির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি

তারপর?

ধনঞ্জয় বলিলেন— যখন সত্যই বুঝতে পারলাম ইনি শঙ্কর সিং নয়, তখন মন নিরাশায় ভরে গেল। শঙ্কর সিংকে ধরেছি মনে করে যেমন আনন্দ হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ বিষাদে বুক অন্ধকার হয়ে গেল। সাতদিনের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ খুঁজে একটি লোককে ধরবার চেষ্টা যে আমার কত বড় পাগলামি তা বুঝতে পারলাম। সত্যিই তো! শঙ্কর সিং যদি কলকাতায় না এসে দিল্লী কিম্বা বোম্বাই গিয়ে থাকেন? যদি তিনি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকেন তাহলে তাকে ধরব কি করে? তিনি যে কলকাতায় এসেছেন এ খবর মিথ্যাও তো হতে পারে।

কিন্তু এ কয়দিনের মধ্যে যদি কুমারকে খুঁজে না পাই তাহলে উপায়? হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। কুমারকে যতদিন না পাই ততদিন আর কোনো লোককে শঙ্কর সিং সাজিয়ে কি কাজ চলে না? এই যে বাঙ্গালী যুবাপুরুষটি তলোয়ার খেলছেন এঁকে যদি বিদ্যুৎ চমকের মত এই চিন্তা আমার মাথায় জ্বলে উঠল।

স্থির হয়ে ভাববার জন্য আমি সেক্রেটারি সাহেবের ঘরে এসে বসলাম। তিনি আমার বিচলিত অবস্থা দেখে যত্ন করে বসালেন এবং নানাপ্রকার আলাপে আমাকে শান্ত

করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাস্তবিক এই বাবুটির মত প্রকৃত সজ্জন আমি খুব কম দেখেছি।

আমার মাথায় কিন্তু এই সর্বগ্রাসী চিন্তা আগুনের মত জ্বলতেই লাগল। কি উপায়! কি উপায়! শেষে উদিত সিংয়ের কূটবুদ্ধিই জয়ী হবে! আর আমি রাজার কাজে চুল পাকিয়ে শেষে এই চব্বিশ বছরের ছোঁড়ার কাছে বাজিমাৎ হয়ে মুখে কালি মেখে দেশে ফিরে যাব! দেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? আর সব সহ্য হবে, কিন্তু উদিত সিং আর ময়ূরবাহনের বাঁকা বিদ্রূপভরা হাসি আমার সহ্য হবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আমি সেক্রেটারিবাবুর ঘরে বসে ভাবতেই লাগলাম। তিনিও আমায় নিজের চিন্তায় মগ্ন দেখে কাজকর্মে মন দিলেন। তারপর যখন ভেবে আর কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না, এমন সময় ইনি তলোয়ার খেলা শেষ করে অন্যান্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর ভাবতে পারলাম না। মনে করলাম, নিয়তির মনে যা আছে তা যখন হবেই এবং ঝিন্দ রাজ্যটাকে বাজি ধরে যখন জুয়া খেলতেই বসেছি, তখন একবার ভাল করেই জুয়া খেলব। সর্বস্ব হারানোই যদি ভাগ্যে থাকে তবে খেলার উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হই কেন? না খেললেও সেই হারতেই হবে!–সেক্রেটারিবাবুর কাছ থেকে ওঁর ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর এখানে এসে যখন এই ছবিখানার ওপর চোখ পড়ল তখন বুঝলাম যে আমি নিয়তির হাতের খেলার পুতুল মাত্র; আমি যদি না আসতাম নিয়তি কান ধরে আমাকে এখানে টেনে আনত। বাবুজি, এ দুনিয়াটা একটা সতরঞ্চের ছক, দেড় শতাব্দী আগে সুদূর মধ্যভারতের এক খেলোয়াড় যে চাল দিয়েছিলেন, আজ তার পাল্টা চাল দেবার জন্যে আপনার ডাক পড়েছে। এ ডাক অমান্য করবার উপায় নেই— এ খেলা খেলতেই হবে। এই নিয়তির বিধান।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী মৌন হইলেন। প্রায় পাঁচমিনিট কাল ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ গৌরীশঙ্কর উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল— আমি রাজী। রাজা হবার সুযোগ জীবনে একবার বই দুবার আসে না, অতএব এ সুযোগ ছাড়া যেতে পারে না। ভগবান যখন রাজকুমারের মত চেহারাটা ভুল করে দিয়ে ফেলেছেন, তখন দিনকতক রাজত্ব করে নেওয়া যাক। দাদা, কি বল?

শিবশঙ্কর বলিলেন— না ভেবে-চিন্তে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। রাজা হবার বিপদও তো আছে। এই রকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাবে খামকা রাজী না হয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা উচিত।

গৌরী হাসিয়া বলিল— দাদা, কথাটা নেহাৎ লোলচর্ম বৃদ্ধের মত হল। মুর্তিমান রোমান্স আমাদের বাড়ি বয়ে এসে চেয়ারে আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছেন, আর আমরা কিনা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে সময় নষ্ট করব?

—যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে।
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে পুচ্ছ নাচাতে!

শিবশঙ্কর ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিলেন–পুচ্ছ নাচাতে পারলেও সে কাজটা সব সময় শোভন এবং রুচিসঙ্গত নয়। গৌরী, তুই চুপ করে বস, আমি এঁকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি। ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন–দেখুন, আমার ভাই রাজা-রাজড়ার চালচলন রীতিনীতি কিছু জানেন না, সুতরাং রাজা সাজতে গেলে তাঁর ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী।

ধনঞ্জয় বলিলেন— সম্ভাবনা একেবারে নেই তা বলতে পারি না; তবে আমি যতক্ষণ সঙ্গে থাকব ততক্ষণ নেই।

শিবশঙ্কর বলিলেন— দ্বিতীয়ত ঝি দেশের প্রচলিত ভাষা ওঁর জানা নেই। এ একটা মস্ত আপত্তি।

ধনঞ্জয় বলিলেন— আমরা উপস্থিত যে ভাষায় কথা কইছি, তাই ঝিন্দের প্রচলিত ভাষা; এ ভাষায় আপনার ভাই তো চমৎকার কথা বলেন।

শিবশঙ্কর বলিলেন–তা যেন হল। কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আমার ভাই যদি জাল রাজা বলে ধরা পড়েন, তখন তো তাঁর বিপদ হতে পারে।

ধনঞ্জয় ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন— বিপদের আশঙ্কা আছে অবশ্যই। কিন্তু বাবুসাব, বিপদের ভয়ে যদি চুপ করে বসে থাকতে হয় তাহলে তো কোনো কাজই করা চলে না।

শিবশঙ্কর পুনশ্চ বলিলেন—প্রাণের আশঙ্কাও থাকতে পারে?

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন— তা থাকতে পারে বৈকি।

আমি আমার ভাইকে যেতে দিতে পারি না।

ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হইয়া উঠিল; বলিলেন–তবে কি বুঝব বাঙ্গালী জাতটা সত্যই ভীরু! এ নিন্দা আমি অনেকের মুখে শুনেছি বটে কিন্তু এতদিন বিশ্বাস করিনি।

শিবশঙ্করের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন–সখ করে পরের বিপদ ঘাড়ে না নেওয়া ভীরুতা নয়।

ধনঞ্জয় বলিলেন— সব বিপদ থেকে নিজের প্রাণটুকু সাবধানে বাঁচিয়ে চলা সুবুদ্ধির কাজ হতে পারে, সাহসের কাজ নয় বাবুজি।

শিবশঙ্কর বলিলেন–আমি তর্ক করতে চাই না। আপনার এ প্রস্তাবে আমার মত নেই।

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনারও কি এই মত?

গৌরী মিনতির চক্ষে একবার দাদার দিকে চাহিল— কোনো উত্তর দিল না।

ধনঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—অন্য কোনো প্রদেশের—মারাঠী কি গুজরাটী যুবককে যদি এ প্রস্তাব করতাম, সে এক মুহূর্ত বিলম্ব করত না। আর আপনারা দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর! যাক–আমার আর কিছু বলবার নেই।

শিবশঙ্কর উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া ধনঞ্জয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন–আমাদের পূর্বপুরুষ কালীশঙ্করের সম্বন্ধে আপনি অনেক কথা জানেন এই ইঙ্গিত কয়েকবার করেছেন। শেষ বয়সে তিনি খুন হয়েছিলেন এ খবর আপনার জানা আছে কি?

খুন হয়েছিলেন?

হ্যাঁ। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আপনারই দেশের কোনো লোক তাঁকে খুন করিয়েছিল।

তার কোনো প্রমাণ আছে কি?

প্রমাণ কিছু নেই। শুধু একখানা ছোরা আছে যা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছিল।

শুধু একখানা ছোরা?

হ্যাঁ।

ছোরাখানা একবার দেখতে পারি কি?

চাবি দিয়া টেবলের দেরাজ খুলিয়া শিবশঙ্কর একটা গহনার বাক্সের মত চ্যাপ্টা ধরনের মখমলের বাক্স বাহির করিলেন। তারপর সেটা খুলিয়া মখমলের খাঁজকাটা আসনের উপর হইতে সাবধানে ছুরিখানা তুলিয়া ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। ঝকঝকে ধারালো প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা ভোজালীর মত ঈষৎ বাঁকা বিচিত্র গঠনের ছুরি— কোথাও মলিনতা বা মরিচার একটু চিহ্ন নাই। সোনার মুঠ এবং ইস্পাতের ফলা যেন বিদ্যুতের আলোয় হাসিয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় গভীর মনঃসংযোগে ছোরাখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার লোহার মত মুখ যেন আরো কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে গলাটা পরিষ্কার করিয়া তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন–এতদিনে কালীশঙ্করের জীবনের ইতিহাস আমার কাছে সম্পূর্ণ হল। এই উপসংহারটুকুই আমি জানতাম না বাবুজি।

তারপর ছোরাখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন–এ ছোরা কার জানেন? ঝিন্ রাজবংশের। বংশের আদিপুরুষ স্মরজিৎ সিংহের আমল থেকে এ ছুরি রাজবংশের দণ্ড মুকুটের মত মহামূল্য সম্পত্তি বলে চলে আসছিল। তারপর হঠাৎ শতবর্ষ পূর্বে ছুরিখানা আর খুঁজে

পাওয়া যায় না। এ ছুরি যে আপনার বংশে এসে আশ্রয় নিয়েছে তা বোধ হয় একজন ছাড়া আর কেউ জানত না। ছুরির মুঠের উপর কতকগুলি অক্ষর খোদাই করা আছে—পড়তে পারেন কি?

শিবশঙ্কর বলিলেন— না, আমি অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারিনি।

ধনঞ্জয় বলিলেন— এ অক্ষরগুলি প্রাচীন সৌরসেনী ভাষায় লেখা। এর অর্থ হচ্ছে যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে এই ছুরি তার জন্য।

শিবশঙ্কর ছুরিখানা নিজের হাতে লইয়া লেখাগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে অন্যমনস্কে বলিলেন— হতেও পারে— হতেও পারে। তারপর?

ধনঞ্জয় বলিলেন–তারপর আর কিছু নেই। এই ছুরি একদিন যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল, সেই রক্ত আপনাদের শরীরে বইছে। সেই রক্ত আজ আপনাদের ডাকছে ঝিন্দে যাবার জন্য। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? আশ্চর্য!

গৌরীশঙ্কর বলিয়া উঠিল— আমি শুনতে পাচ্ছি।–দাদা, অনুমতি দাও আমি যাব।

শিবশঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন–কিন্তু কিন্তু-অজানা দেশ কতরকম বিপদ—

গৌরী বলিল—আমি ছেলেমানুষ নই। তুমি মন খুলে অনুমতি দাও, কোনো বিপদ হবে না।

শিবশঙ্কর বলিলেন— তা না হয়-কিন্তু—

ধনঞ্জয়ের মুখের বাঁকা বিদ্রূপ আরও ক্ষুরধার হইয়া উঠিল। গৌরী ছুরিখানা টেবলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তীক্ষকণ্ঠে বলিল–দাদা, ফের যদি সর্দার আমাদের ভীরু বলবার অবকাশ পায়, তাহলে এই ছুরি দিয়ে আমি একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ফেলব। বারবার ভীরু অপবাদ আমার সহ্য হবে না।

শিবশঙ্কর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন– আচ্ছা যা—আমি অনুমতি দিলাম। তারপর ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন— দেখুন, আমরা এই বাঙালী জাতটা, যতক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকে ততক্ষণ সহজে ঘর থেকে বার হই না—পাছে রাস্তায় কুকুরে কামড়ায় কিম্বা গাড়ি চাপা পড়ি; কিন্তু একবার রক্ত গরম হলে আর রক্ষে নেই, তখন একলাফে একেবারে দুঃসাহসিকতার চরম সীমায় পৌঁছে যাই। ছুরিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া বলিলেন– এর ওপর ঝিন্দের রাজার আর কোনো অধিকার নেই। রক্তের দাম দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ একে কিনে নিয়েছেন; এ ছুরি আমাদের বংশের। সুতরাং আমি এ ছুরি হাতে নিয়ে বলতে পারি-যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে, এ ছুরি তার জন্য। সাবধান সদর ধনঞ্জয়! ভীরু বলে যেন আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবেন না। বলিয়া সহাস্যে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় দ্রুত আসিয়া দুই হাতে দুই ভায়ের হাত ধরিলেন, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন— আমি জানতাম আমি জানতাম বাবুজি। কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধর কখনো ভীরু হতে পারে না।

রাত্রে আহারাদির পর দুই ভাই এবং অচলা পুনরায় লাইব্রেরি ঘরে আসিয়া বসিলেন। গৌরী এবং শিবশঙ্কর দুইজনেই অন্যমনস্ক—অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। শেষে অচলা বলিল— কি হল তোমাদের? মুখে একটি কথা নেই—এত ভাবছ কি?

শিবশঙ্কর চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—গৌরী কাল বিদেশে যাচ্ছে।

অচলা বলিল——কৈ আগে তো কিছু শুনিনি, কখন ঠিক করলে?

গৌরী বলিল— আজই। আবার কিছুদিন ঘুরে আসা যাক বৌদি।

অচলা বলিল—সত্যিই ঘটকের ভয়ে পালাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো?

গৌরী হাসিয়া বলিল— না গো না। এবার দেখো না, তুমি যা চাও তাই একটা ধরে নিয়ে আসব। আর তা যদি নিতান্তই না পারি, অন্তত নিজে সশরীরে ফিরে আসবই।

অচলা শঙ্কিত হইয়া বলিল–ও কি কথা ঠাকুরপো। কোথায় যাচ্ছ ঠিক করে বল।

গৌরী বলিল— বলবার উপায় নেই বৌদি—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফিরে এসে যদি পারি বলব। ততদিন আমাদের ঘরের অচলা লক্ষ্মীটির মত ধৈর্য ধরে থেকো।

অচলার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে চোখ মুছিয়া বলিল— কি কাজে যাচ্ছ তুমিই জান; আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে তোমাদের কথা শুনে।

গৌরী বলিল— এই দেখ! একেবারে কান্না? এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে-নারী নদীবৎ— স্রেফ জল। তোমাদের নিংড়োলে কতখানি করে জল বেরোয় বল তো বৌদি?

অচলা উত্তর দিল না। গৌরীর জোর করিয়া পরিহাসের চেষ্টা অন্য দুইজনের আশঙ্কা-ভারাক্রান্ত মনে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া যেন ঘরের আবহাওয়াকে আরও মুহ্যমান করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন–রাত হল, গৌরী, শুগে যা। কালীশঙ্করের ইতিহাস যদি কিছু পাস্-নোট করে নি। আর এই ছুরিখানাও তুই সঙ্গে রাখ। বলিয়া দেরাজ হইতে আবার ছোরাটা বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলু পৌঁছিল

ছোট লাইনের রেলপথ ব্রিটিশ রাজ্যের সদর স্টেশন ছাড়িয়া প্রায় ত্রিশ মাইল পার্বত্য চড়াই ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে ঝিন্ রাজ্যের আরম্ভ। এই ছোট লাইনের ছোট ঘোট গাড়িগুলি পাহাড়ী পথে কখনো হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কখনো বাঁশীর আর্তস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বহির্জগতের যাত্রীগুলিকে ঝিন্দের তোরণদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। এই ত্রিশ মাইলের মধ্যে কেবল আর একটি স্টেশন আছে —সেটি ঝড়োয়া স্টেশন। ঝিঝড়োয়ার গিরিসঙ্কটে প্রবেশের উহা দ্বিতীয় দ্বার। এই দুই স্টেশনে নামিয়া যাত্রীদের হাঁটা পথ ধরিতে হয়। ঝিন্‌ঝড়োয়া রাজ্যের মধ্যে এখনো রেল প্রবেশ করে নাই।

উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোলের কাছে ছোট সুদৃশ্য ঝি স্টেশনটি নিতান্তই খেলাঘরের স্টেশন বলিয়া মনে হয়। কারণ এইখান হইতে অভ্রভেদী পর্বতের শ্রেণী শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলিয়া আকাশের একটা দিক একেবারে আড়াল করিয়া দিয়াছে। উহারই অভ্যন্তরে, মালার ভিতর নারিকেলের শস্যের ন্যায় ঝিন্‌ঝড়োয়া রাজ্য লুকাইয়া আছে। স্টেশনের সম্মুখ হইতে একটা অনতিপ্রশস্ত পথ পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাড়োয়ারীর পাগড়ির মত সরু পথ পর্বতের বিরাট মস্তক বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্ধ্বে উঠিয়াছে। সে পথে ঘোড়া কিম্বা মানুষ-টানা রিকশা চলিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো প্রকার যানবাহনের চলাচল অসম্ভব।

স্টেশনের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফ অফিস, সেখান হইতে টেলিগ্রাফ তারের একটা প্রান্ত পাহাড়ের ভিতর দিয়া ঝিন্দের দিকে গিয়াছে। স্টেশনের কাছে দুইটি দোকান, একটি সরাইখানা শহর বাজার কিছুই নাই। দিনে রাত্রে দুইবার ট্রেন আসে, সেই সময় যা-কিছু যাত্রীর ভিড়। অন্য সময় স্থানটি নিঝুমভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমাইতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ঝিন্ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার প্ল্যাটফর্মের উপর রৌদ্রে চারপাই বিছাইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, দূর হইতে ট্রেনের বাঁশীর শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তখন ধীরে-সুস্থে গাত্রোত্থান করিয়া কুলি ডাকিয়া সিগন্যাল ফেলিবার হুকুম দিলেন; আর একজন কুলিকে চারপাইখানা সরাইয়া ফেলিতে বলিলেন। তারপর চোখে চশমা ও মাথায় টুপি আঁটিয়া গম্ভীরভাবে কঙ্করাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের উপর পদচারণ করিতে লাগিলেন।

লোহালক্কড়ের ঝন ঝন ঝড় ঝড় শব্দে, ইঞ্জিনের পরিশ্রান্ত ফোঁস ফোঁস আওয়াজ এবং বাঁশীর গগনভেদী চিৎকারে শব্দজগতে বিষম হুলস্থূল বাধাইয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল। গাড়ি থামিলেই গুটিকয়েক আরোহী মন্থরভাবে মোটঘাট লইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিল। অধিকাংশই মোসাফির, তাহার মধ্যে দুএকজন ভদ্রলোকশ্রেণীভুক্ত–দেখিলে মনে হয় ঝিন্দে বেড়াইতে আসিয়াছে। সম্প্রতি রাজ-অভিষেক উপলক্ষে আবার একটা কিছু কাণ্ড ঘটিতে পারে, এই আশায় সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারও সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই ট্রেনে আসিয়াছে।

স্টেশনমাস্টার মহাশয় অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত যাত্রীদের টিকিট গ্রহণ করিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মের ফটক বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। স্টেশনমাস্টারের নাম স্বরূপদাস; লোকটির বয়স হইয়াছে; গত বিশ বৎসর তিনি এই ঝিন্দের সিংহদ্বারে প্রহরীর কাজ করিতেছেন। বাহিরের লোক যে কেবল তাঁহার কৃপায় ঝিন্দে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে একথা সর্বদা তাঁহার মনে। জাগরূক থাকে। তাই নিজের পদমর্যাদা স্মরণ করিয়া আগন্তুক যাত্রীদের সম্মুখে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকেন। স্পর্ধারত কোনো যাত্রী কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সগর্ব বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর না দিয়াই অবজ্ঞাভরে আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করেন।

ঘরে বসিয়া স্বরূপদাস দৈনিক হিসাব প্রায় শেষ করিয়াছেন এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল—স্টেশনমাস্টার, এখনি আমার দুটো ভালো ঘোড়া চাই।

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া মুখ তুলিতেই স্টেশনমাস্টার একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। দেখিলেন দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া—সদার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। প্রকাণ্ড পাগড়ি তাঁহার সুকৃষ্ণ মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু কানের রুবি দুইটা খরগোসের চোখের মত জ্বলিতেছে। স্বরূপদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফৌজী প্রথায় সেলাম করিল। মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

ধনঞ্জয় ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন–শুনতে পাচ্ছ? এখনি দুটো ভাল ঘোড়া আমার চাই। ঝিন্দে যেতে হবে।

যো হুকুম! বলিয়া আর একবার সেলাম করিয়া প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে স্বরূপদাস বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে খবর দিল যে, সৌভাগ্যবশত দুইটা ঘোড়া পাওয়া গিয়াছে— জিন্ চড়াইয়া মোসাফিরখানার ফটকের কাছে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে, এখন সর্দার মর্জি করিলেই হয়।

সর্দার একখানা দশটাকার নোট তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন–গোলমাল করো না। তোমার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ কর। উঁকি মেরো না বুঝলে? যাও।

নোটখানা কুড়াইয়া লইয়া স্বরূপদাস সবিনয়ে নিজের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সর্দার ধনঞ্জয় এখন একবার প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন— কেহ কোথাও নাই। কুলি দুইটা চলিয়া গিয়াছে পরদিন সকালের আগে ট্রেন ছাড়িবে না, কাজেই তাহাদের ছুটি। আগত ট্রেনের গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যানেরা বোধ করি ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সরাইখানায় ঢুকিয়াছে। পরিত্যক্ত গাড়িখানা নিষ্প্রাণভাবে লাইনের উপর পড়িয়া আছে। সর্দার ধনঞ্জয় একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ির সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন— বেরিয়ে আসুন রাস্তা সাফ।

একজন সাহেববেশধারী লোক গাড়ি হইতে নামিলেন। মাথায় ফেল্টের টুপি মুখের উর্ধ্বাংশ প্রায় ঢাকিয়া দিয়াছে, ওভারকোটের উল্টানো কলারের আড়ালে মুখের অধোভোগ ঢাকা। এই দুয়ের মধ্য হইতে কেবল নাকের ডগাটুকু জাগিয়া আছে।

দুইজনে নীরবে স্টেশনের ফটক পর্যন্ত গেলেন। তারপর ধনঞ্জয় বলিলেন–একটু দাঁড়ান–আমি আসছি!

ফিরিয়া স্টেশনমাস্টারের ঘর পর্যন্ত আসিয়া ধনঞ্জয় দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন বন্ধ। জিজ্ঞাসা করলেন—মাস্টার ঘরে আছ?

ভিতর হইতে শব্দ হইল— হুজুর!

উঁকি মারোনি তো?

জী নহি।

আবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, যদি কিছু বুঝে থাকো কারুর কাছে উচ্চারণ করো না। উচ্চারণ করলে গদানা নিয়ে মুস্কিলে পড়বে। বুঝেছ?

ভীতকণ্ঠে জবাব আসিল–হুজুর।

মৃদু হাসিয়া ধনঞ্জয় ফিরিয়া গেলেন। সরাইখানার সম্মুখে দুইজনে দুই ঘোড়ায় চড়িয়া পার্বত্য পথ ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ধনঞ্জয় সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এতদূর পর্যন্ত তো নিরাপদে আসা গেছে মাঝে আঠারো মাইল

বাকী—আজ রাত্রে যদি আপনাকে রাজমহলের মধ্যে পুরতে পারি— তারপরে ব্যস। স্টেশনমাস্টারকে খুব ধমক দিয়েছি সে যদি বা কিছু সন্দেহ করে থাকে– ভয়ে প্রকাশ করবে না।

ধনঞ্জয় যদি সঞ্জয়ের মত দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাঁহারা পর্বতের আড়ালে অন্তর্হিত হইলে পর স্টেশনমাস্টার আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইল। তারপর সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দৌড়িতে আরম্ভ করিল। টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল–বৃজলাল, জলদি, জলদি, একটা ফর্ম দাও তো। জরুরী তার পাঠাতে হবে।

বৃজলাল একহাতে কল নাড়িতে নাড়িতে অন্য হাতে একটা ফর্ম দিল। মাস্টার কিছুক্ষণ ভাবিয়া তাহাতে লিখিল–

আলু পৌঁছিয়াছে, সঙ্গে একটি অন্য মাল আছে চেনা গেল না। ঘোড়ার পিঠে ঝিল্ রওনা হইল।

এই লিখিয়া নিজের নাম সহি করিয়া টেলিগ্রামটি রাজধানীর এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুরুষোত্তমদাসের নামে পাঠাইয়া দিল।

তারপর নিজের গুদানার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালো ঘোড়ার সওয়ার

আলু এবং অজ্ঞাত মালটি উপরে উঠিতেছেন।

যত উপরে উঠিতেছেন, শীতের সায়াহ্নে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ততই সুন্দর ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। পথের একধারে খাড়া পাহাড় ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, অন্যধারে তেমনি খাড়া খাদ কোন্ অতলে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে সঙ্কীর্ণ ঢালু পথ দেওয়ালের গায়ে কার্নিশের মত যেন কোনক্রমে নিজেকে পাহাড়ের অঙ্গে জুড়িয়া রাখিয়াছে। পথ কোথাও সিধা নয়, কেবলি ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কোথাও সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইতেছে। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী দুইজন চলিতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গা কোথাও বনজঙ্গলে ঢাকা, কোথাও বা কর্কশ উলঙ্গ। পথের যে-ধারটায় পাহাড়, সেই ধারে স্থানে স্থানে পাথর ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল— রাস্তার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া নীচের খাদে ঝরিয়া পড়িতেছে। কোথাও বন্য ফলের গাছ সারা অঙ্গে রাঙা রাঙা ফল লইয়া পথের উপর প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার রেকাবে উঁচু হইয়া দাঁড়াইলে হাত বাড়াইয়া ফল পাড়া যায়! একবার উর্ধ্বে গাছপালার মধ্যে একটা ময়ুরের গায়ে সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। ঘোড়র ক্ষুরের শব্দে সচকিত হইয়া ময়ুরটা ঘাড় বাঁকাইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর

সজোরে দুইবার কেকাধ্বনি করিয়া দ্রুতপদে পাহাড়ের ফাঁকে গিয়া লুকাইল। তাহার উচ্চ কেকারবের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া বারবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আর একবার একটা মোড় ফিরিতেই ভীষণ গর্গম্ শব্দে চমকিত হইয়া গৌরীশঙ্কর দেখিল, দূরে পাহাড়ের একটা রন্ধ্র বহিয়া প্রকাণ্ড একটা ঝণা নিঝরশীকরে চারিদিক বাষ্পচ্ছন্ন করিয়া গভীর খাদে গিয়া পড়িতেছে। অস্তমান সূর্যকিরণে সেটাকে সোনালী জরি-মোড়া অপ্সরীর দোদুল্যমান বেণীর মত দেখাইতেছে।

মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া উৎফুল্লনেত্রে ঝর্ণা দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল–সর্দার, তোমাদের রাজ্য রাজা হবার মত দেশ বটে। কুমারসম্ভব পড়েছ?–

ভাগীরথীনিঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ!

গদ্যপ্রকৃতি ধনঞ্জয় বলিলেন–টুপিটা একেবারে খুলে ফেললেন যে! শেষে তীরে এসে তরী ডোবাবেন? টুপি পরুন।

গৌরী সহাস্যে বলিল— তা না হয় পরছি। কিন্তু লোক কৈ? এতটা রাস্তা এলুম কোথাও একটা জনমানব নেই। একটু জোরে ঘোড়া চালালে হয় না?

ধনঞ্জয় বলিলেন— না, ট্রেনের যাত্রীরা সব এগিয়ে আছে, তারা এগিয়েই থাক। অন্ধকার হোক— তখন জোরে চালালেই হবে।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল আগাগোড়াই কি চড়াই উঠতে হবে? তোমাদের রাজ্যটা কি পাহাড়ের টঙের ওপর?

ধনঞ্জয় বলিলেন— না, আরো মাইল সাত-আট উঠতে হবে। শিরপেঁচ সরাইয়ের পর থেকে উত্রাই আরম্ভ। তবে যতটা উঠতে হবে ততটা নামতে হবে না। ঝিঝড়োয়ার গড়ন অনেকটা। কানা-উঁচু কাঠের রাতের মত। আমরা এখন বাইরে থেকে পিঁপড়ের মত তার কানা বেয়ে উঠছি, শিরচে সরাই পার হয়ে আবার কানা বেয়ে নেমে তবে ঝিন্দের সরজমিনে গিয়ে পৌঁছুতে হবে।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল– আচ্ছা, ও ঝর্ণার্টার নাম কি? এতবড় ঝর্ণা আমি আর কোথাও দেখিনি।

ধনঞ্জয় বলিলেন— ওটা সামান্য পাহাড়ে ঝর্ণা নয়, আমাদের দেশের যে প্রধান নদী, সেই কিস্তা এখানে ঋণী হয়ে রাজ্য থেকে ঝরে পড়েছে। কিস্তার উৎপত্তি রাজ্যের অন্য প্রান্তে, সেখান থেকে বেরিয়ে রাজ্যের বুক চিরে এসে এইখানেই চঞ্চলা অঙ্গরীদের মত সে পাহাড়ের বুকে ঝাঁপিয়ে। পড়েছে।

গৌরী হাসিয়া বলিল— বাহবা সর্দার, তোমার প্রাণেও গদ্য এসে পড়েছে দেখছি। তবে আর ভাবনা নেই। আচ্ছা, ঝি সী-লেল থেকে কত উঁচু বলতে পারো?

চার হাজার ফুটের কিছু কম, তবে চারধারের পাহাড়গুলো আরো উচু। ঐ দেখুন না।– ধনঞ্জয়ের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া গৌরী দেখিল, আরো কিছুদূর উপর হইতে পাইনের গাছ আরম্ভ হইয়াছে। সরু লম্বা গাছগুলি যেন সারবন্দী হইয়া অদৃশ্য রেখার উর্ধ্বে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে সূর্য বাঁ-দিকের নিম্নভূমির পর পারে অস্ত যাইবার উপক্রম করিল। খাদের অন্ধকারের ভিতর হইতে শৃগালের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। উপরে তখনো দিন রহিয়াছে কিন্তু নিম্নের উপত্যকায় রাত্রি নামিয়াছে। দুইজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন।

সহসা সম্মুখে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি হইল। ধনঞ্জয় চকিত হইয়া ঘোড়ার উপর সোজা হইয়া বসিলেন, গৌরী টুপিটা তাড়াতাড়ি চোখের উপর টানিয়া দিল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে রাস্তার একটা মোড় ছিল, দেখিলে মনে হয় যেন পথ ঐ পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ অতলস্পর্শ খাদের সম্মুখে থামিয়া গিয়াছে। ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁকের মুখ তীরবেগে ঘুরিয়া একজন অশ্বারোহী দেখা দিল। সূর্য তখনো অস্ত যায় নাই, তাহার শেষ রশ্মি সওয়ারের উপর পড়িল। কুচকুচে কালো ঘোড়া– মুখ ও লাগাম ফেনায় সাদা হইয়া গিয়াছে— আর তাহার পিঠে ঝুঁকিয়া বসিয়া আরোহী নির্দয়ভাবে তাহার উপর কশা চালাইতেছে।

ধনঞ্জয়ের দাঁতের ভিতর হইতে চাপা আওয়াজ বাহির হইল— ময়ূরবাহন! কি আপদ। পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন, বেরিয়ে যাক। বলিয়া বাঁ হাতে নিজের মুখের উপর রুমাল চাপিয়া ধরিলেন।

রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে কালো ঘোড়ার সওয়ার প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। বোধ করি আর এক মুহূর্তে সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া যাইত কিন্তু হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পথের ধারে দুইটি অশ্বারোহীর উপর পড়িতেই সে দু হাতে রাশ টানিয়া ধরিল ঘোড়াটা সম্মুখের দুই পা তুলিয়া সম্পূর্ণ একটা পাক খাইয়া এই দুবার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরবাহনের উচ্চকণ্ঠের হাস্যধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলিল। হাসি থামিলে সে বলিল— আরে কে ও? সর্দার ধনঞ্জয় নাকি? বনে বনে কুঁড়ি এ বধুয়া কাঁহা গয়ি—তোমার বিরহে আমরা সবাই ভয়ঙ্কর হেদিয়ে উঠেছিলাম যে সর্দার! এতদিন ছিলে কোথায়?

সে খবরে তোমার দরকার নেই। বলিয়া ধনঞ্জয় চলিবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঘোড়া পা বাড়াইবার পূর্বেই ময়ূরবাহনের ঘোড়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বলি চললে যে! একটু দাঁড়াও না ছাই। সফর থেকে আসছ, দুটো কথাও কি বন্ধুলোকের সঙ্গে কইতে নেই?— সঙ্গে ওটি কে? ময়ূরবাহন কথা কহিতেছিল বটে কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গৌরীশঙ্করের উপর নিবদ্ধ ছিল— কৌতূহল ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। আপাদমস্তক ঢাকা ছদ্মবেশী মানুষটি কে? কোন জাতীয়? বলি স্ত্রীজাতীয় নয় তো?–অ্যাঁ সর্দার! বৃদ্ধ বয়সে

তোমার এ কি রোগ? হায় হায়! অসৎ সঙ্গে পড়ে মানুষের কি সর্বনাশই নয়। শঙ্কর সিং শেষে তোমার চরিত্রেও ঘুণ ধরিয়ে দিলে! বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িল।

পথ ছাড়ো। বলিয়া ধনঞ্জয় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ময়ূরবাহন নড়িল না, রক্তের মত রাঙা দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল–তা কি হয় সর্দার! তুমি একটা আদমের কালের বুড়ো, এই ছুকরিকে নিয়ে পালাবে আর আমি জোয়ান মর্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখব? এ হতেই পারে না–বিলকুল নামঞ্জুর!

পথ ছাড়বে না?

ছাড়বো বই কি, কিন্তু তার আগে তোমার পিয়ারীকে একবার দর্শন— বলিয়া গৌরীর দিকে অগ্রসর হইল।

ব্যস্! খবরদার! ময়ূরবাহন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ধনঞ্জয়ের হাতে একটা ভীষণদর্শন কালো রিভলবার নিশ্চলভাবে তাহার বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে।

ময়ূরবাহন দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সহজ স্বরে বলিল— খামোশ। আজ জিতে গেলে সর্দার। তোমার পিয়ারী নাজনির চাঁদমুখ দেখবার বড়ই আগ্রহ হয়েছিল তা থাক, আর এক সময়ে হবে।—ভাল কথা, তোমার শঙ্কর সিং ভাল আছে তো? অভিষেক ঠিক সময়ে হচ্ছে তো? এবার কিন্তু অভিষেক পিছিয়ে গেলে আমরা সবাই ভারি দুঃখিত হব

তা বলে দিচ্ছি। খুব সাবধানে তাকে আটকে রেখো আবার না পালায়। আচ্ছা, এক কাজ করলে তো পারো। শঙ্কর সিং যখন পরের এঁটো খেতে এত ভালবাসে তখন কতকগুলি বিয়াহি আওরাৎ ধরে এনে তার মহলে পুরে রেখে দাও না! তাহলে শঙ্কর সিং আর কোথাও যাবে না। আর ভেবে দেখ, রাজা হলেই তো আবার ঝড়োয়ার কুমারীকে বিয়ে করতে হবে; ও সোঁদা ফুল শঙ্কর সিংয়ের ভাল লাগবে না, তার চেয়ে–

ধনঞ্জয়ের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল–চোপরাও অসভ্য কুত্তা! ফের যদি ও নাম মুখে এনেছিস, গুলি করে তোর খুলি উড়িয়ে দেব।

ফুঃ! তাচ্ছিল্যভরে ময়ূরবাহন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর ঘাড় বাঁকাইয়া ধনঞ্জয়ের দিকে বেনিয়া বান্দার বাচ্চা! এই কথাগুলা নিক্ষেপ করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বৈশাখী ঘূর্ণির মত নিম্নাভিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো ঘোড়ার সওয়ার মিলাইয়া গেলে ধনঞ্জয় রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন। বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন— বেয়াদব শয়তান!

গৌরী টুপি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—লোকটা কে সর্দার?

ধনঞ্জয় বলিলেন–উদিত সিংয়ের ইয়ার, আর তার শনি। উদিতের চেয়েও বদমায়েস যদি কেউ থাকে তো ঐ ময়ূরবাহন।

গৌরী বলিল— কিন্তু যাই বল, চেহারাখানা সত্যিই ময়ূরবাহনের মত। কি নাক কি মুখ কি চোখ! আর অদ্ভূত ঘোড়সওয়ার।

ধনঞ্জয় কতকটা নিজমনেই বলিলেন— ইচ্ছে হয়েছিল শেষ করে দিই। কেন যে দিলাম না তাও জানি না। যাক, আর দেরি করে কাজ নেই রাত্রি হয়ে গেছে। এখনো প্রায় অর্ধেক পথ বাকি। দুপুর রাত্রির মধ্যে সিংগড়ে পৌঁছুনো চাই।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— ঝড়োয়ার কুমারীর সঙ্গে বিয়ের কথা কি বলছিল?

ধনঞ্জয় বলিলেন— ঝড়োয়ায় উপস্থিত রাজা নেই —মৃত রাজার একমাত্র মেয়েই রাজ্যের অধিকারিণী। মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুর আগে কুমার শঙ্করের সঙ্গে কস্তুরীবাঈয়ের বিবাহ স্থির করে। গিয়েছিলেন। কথা আছে যে, অভিষেকের দিন কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে শঙ্কর সিংয়ের তিলক হবে।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল— নাবালক রানী— ঝড়োয়ার রাজ্য চলছে কি করে?

ধনঞ্জয় বলিলেন— মন্ত্রী আছে, দেওয়ান আছে, আইন আছে রাজার অভাবে কি রাজ্যের কাজ। আটকায়?

তা বটে! আচ্ছা, এই কস্তুরীবাঈয়ের বয়স কত হবে?

রানীর বয়স? বছর উনিশ-কুড়ি হবে। বলিয়া কুঞ্চিত করিয়া ধনঞ্জয় ঘোড়া চালাইলেন।

আরো দুই-একটা প্রশ্ন মনে উদিত হইলেও গৌরী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

.

ফটকের ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা পড়িতেছে এমন সময় দুইজন ক্লান্ত অশ্বারোহী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রহরী কর্কশকণ্ঠে হাঁকিল— হু কম্ দার?

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে কহিলেন— আমি সর্দার ধনঞ্জয়। রুদ্ররূপকে খবর দাও। জলদি।

অল্পক্ষণ পরেই রুদ্ররূপ আসিয়া ফৌজী-সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ধনঞ্জয় ঘোড়া হইতে নামিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোনো গোলমাল হয়নি?

না। উদিত রোজ একবার করে মহলে ঢোকবার চেষ্টা করেছে, আমি ঢুকতে দিইনি।

বেশ। কুমারের কোনো খবর নেই?

কিছু না।

অভিষেকের আয়োজন সব ঠিক? সমস্ত।

ভার্গবজি আপনার জন্য বড় ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।

আচ্ছা, আর ভাবনার কোনো কারণ নেই। এখন আমাদের ভিতরে নিয়ে চল। আর পাহারা সরিয়ে নাও–কাল থেকে পাহারার দরকার নেই। শুধু তুমি তায়নাৎ থাকো।

যো হুকুম বলিয়া রুদ্ররূপ আলো আনিবার আদেশ দিতেছিল, ধনঞ্জয় মানা করিলেন – আলোর। দরকার নেই— অন্ধকারেই নিয়ে চল।

তখন রুদ্ররূপের অনুগামী হইয়া দুইজনে অন্ধকারে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই

পরদিন প্রাতঃকালে গৌরী তখনো অনভ্যস্ত রাজপালঙ্ক ছাড়িয়া উঠে নাই সর্দার ধনঞ্জয় ভারী মখমলের পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন— ঘুম ভেঙেছে?

গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভেঙেছে। তুমি উঠলে কখন?

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন— আমি ঘুমইনি। — দেওয়ান দেখা করতে আসছেন। তাঁকে সব কথা বলেছি।

গৌরীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এইবার তবে রাজা অভিনয় আরম্ভ হইল . সে একবার চক্ষু বুজিয়া মনকে স্থির ও সংযত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সুদুর কলিকাতায় দাদা ও বৌদিদির মুখ একবার মনে পড়িল।

ধনঞ্জয় তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সাহস দিয়া বলিলেন–কোনো ভয় নেই আমি আছি।

ঘরের বাহিরে খড়মের শব্দ হইল, পরক্ষণেই দেওয়ান বজ্রপাণি ভার্গব প্রবেশ করিলেন।

বিশেষত্ববর্জিত শীর্ণ চেহারা বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, দেখিলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়।

বজ্রপাণি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শয্যায় উপবিষ্ট গৌরীকে একবার দেখিয়া লইয়া হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন– আজ কুমার কেমন আছেন? জ্বর বোধ করি নেই?

ধনঞ্জয় সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন–আজ কুমার ভালই আছেন। ডাক্তার গঙ্গানাথের ঔষধে উপকার হয়েছে বলতে হবে। আজ বোধ হয় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

বজ্রপাণি বলিলেন–সেটা উচিত হবে কিনা গঙ্গানাথকে আগে জিজ্ঞাসা না করে কোনো কাজই হতে পারে না; বিশেষত অভিষেকের যখন আর মাত্র অল্পদিন বাকি তখন সাবধানে থাকতে হবে তো!

গৌরী নির্বাকভাবে একবার ইহার মুখের দিকে, একবার উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। যেন সত্যকার কুমারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুইজন পরম হিতৈষীর মধ্যে চিন্তাযুক্ত গবেষণা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন –কুমার তাহলে এখন শয্যাত্যাগ করুন আমার পূজা এখনো শেষ হয়নি। বলিয়া এই বৃদ্ধ রূপদক্ষ পুনশ্চ গৌরীকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— ব্যাপার কি? আমার আবার অসুখ হল কবে?

ধনঞ্জয় গভীরভাবে বলিলেন— আপনি আজ পঁচিশ দিন অসুখে ভুগছেন–মাঝে অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছিল, এখন একটু ভাল আছেন! রাজবৈদ্য এসে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে, আপনার বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা হয়েছে কিনা।

গৌরী খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল— বুঝেছি। কিন্তু অসুখটা কি হয়েছিল সেটা অন্তত আমার তো জানা দরকার।

ধনঞ্জয় মৃদু হাসিলেন— অত্যন্ত মদ খাওয়ার দরুন আপনার লিভার পাকবার উপক্রম করেছিল।

গৌরী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আরো খানিকটা হাসিল। এতক্ষণে সে আবার সুস্থ অনুভব করিতে লাগিল; কহিল-এ একরকম মন্দ ব্যাপার নয়! একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

ধনঞ্জয় বলিলেন— হাসি নয়, কথাগুলো মনে রাখবেন শেষে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়! নিন, এবার বিছানা ছেড়ে উঠুন।

গৌরী শয্যাত্যাগের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একটি বার-তেরো বছরের মেয়ে ভিতরের একটা দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর হাসি-হাসি মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়া মুক্তার মত দাঁতগুলি একটুমাত্র দেখা যাইতেছে গৌরী অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি পালঙ্কের কাছে আসিয়া মৃদু সুমিষ্টস্বরে বলিল—কুমার, স্নানের আয়োজন হয়েছে।

গৌরী সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এটি কে?

ধনঞ্জয় মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন–তুমি বাইরে অপেক্ষা করগে, কুমার যাচ্ছেন।

মেয়েটি একবার ঘাড় নীচু করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তখন ধনঞ্জয় বলিলেন—এটি আপনার খাস পরিচারিকা।

সে কি রকম?

রাজ-অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই; রাজবংশীয় পুরুষ ছাড়া আমরা কয়েকজন মাত্র প্রবেশ করতে পারি। অন্দরমহলে চাকরবাকর সব স্ত্রীলোক; আপনি যতক্ষণ অন্তঃপুরে থাকবেন, ততক্ষণ স্ত্রীলোকেরাই আপনার পরিচর্যা করবে।

গৌরী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল–এ আবার কি হাঙ্গামা। এ যে আমার একেবারে অভ্যাস নেই সর্দার!

তা বললে আর উপায় কি? রাজবংশের যখন এই কায়দা তখন মেনে চলতেই হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল— কিন্তু এই মেয়েটিকে তো দাসী চাকরানী বলে মনে হল না। মনে হল ভদ্রঘরের মেয়ে।

শুধু ভদ্রঘরের নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ত্রিবিক্রম সিং ঝিন্দের একজন বনেদী বড়লোক।

বিস্ফারিত চক্ষে গৌরী বলিল–তবে?

ধনঞ্জয় সিয়া বলিলেন— এটা একটা মস্ত মর্যাদা। রাজ্যের যে-কেউ নিজের অনূঢ়া মেয়ে বা বোনকে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার পরিচারিকা করে রাখতে পেলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। আমার যদি মেয়ে থাকত আমিও রাখতাম। অবশ্য পরিচারিকা নামে মাত্র রানীদের কাছে থেকে সহবত শিক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য।

এরকম পরিচারিকা আমার কয়টি আছে?

উপস্থিত এই একটি, আর যারা আছে তারা মাইনে করা সত্যিকারের বাঁদী?

অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল— কিছু মনে করো না সর্দার। কিন্তু এই রকম প্রথায় বনেদী ঘরের মেয়েদের কিছু অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কি?

ধনঞ্জয় বলিলেন— সম্ভাবনা নেই এমন কথা বলা যায় না, তবে বাস্তবে কখনো কোনো অনিষ্ট হয়নি। এরা বনেদী ঘরের মেয়ে বলেই একরকম নিরাপদ।

গৌরী বলিল— কিন্তু শঙ্কর সিংয়ের মত চরিত্রের লোক—

শঙ্কর সিংয়ের একটা মহৎ গুণ ছিল— তিনি নিজের অন্তঃপুরের কোনো স্ত্রীলোকের দিকে চোখ তুলে চাইতেন না।

গৌরীর মন বারবার এই সুন্দরী মেয়েটির দিকেই ফিরিয়া যাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল— আচ্ছা, এ মেয়েটি কতদিন এই অন্তঃপুরে আছে?

ধনঞ্জয় বলিলেন— তা প্রায় দুবছর। ও-ই এখন বলতে গেলে অন্দর মহলের মালিক রানী তো কেউ এখন নেই। গত মাস-দুই ও এখানে ছিল না, ওর বাপ ওকে বিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল, তাই আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছে।

গৌরী গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— চমকার মেয়েটি কিন্তু!

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন— হ্যাঁ, তবে এখনো বড় ছেলেমানুষ। ত্রিবিক্রম কেন যে সাত-তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেবার জন্যে লেগেছেন তা তিনিই জানেন।

গৌরী বলিল—কেন মেয়েটির বিয়ের বয়স তো হয়েছে?

ধনঞ্জয় বলিলেন— এদেশে মেয়ে পূর্ণ যৌবনবতী না হলে বিয়ে হয় না। পদাপ্রথা তো নেই, সাধারণত মেয়েরা নিজেরাই মনের মত বর খুঁজে নেয়। অবশ্য বাপ-মার অনুমতি পেলে তবে বিয়ে হয়।

গৌরী মনে মনে বলিল— বাংলাদেশের চেয়ে ভাল বলতে হবে।

এই সময় সেই মেয়েটি দরজা হইতে আবার মুখ বাড়াইয়া বলিল— কুমার, আপনার স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

গৌরী হাসিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, সকৌতুকে চিবুক ধরিয়া তাহার মুখটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি?

সঙ্কোচশুন্য দুইচক্ষু গৌরীর মুখের পানে তুলিয়া মেয়েটি বলিল— আমি চম্পা।

কিছুক্ষণ গভীর স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল— সত্যি। তুমি চম্পা–সূর্যের সৌরভ।

স্নানান্তে যে ঘরটায় গিয়া গৌরী আহারে বসিল, সে ঘরের জানালার নীচেই কিস্তার কালো জল ছলছল শব্দে প্রাসাদমূল চুম্বন করিয়া চলিয়াছে। জানালার বাহিরের রৌদ্র প্রতিভাত ছবির দিকে তাকাইয়া গৌরী একটা নিশ্বাস ফেলিল। বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। দূরে পরিষ্কার আকাশের পটে কালো পাহাড়ের রেখা, নিকটে আলোঝলমল খরস্রোতা পার্বত্য নদী–নদীর দুইকূলে দুইটি সমৃদ্ধ নগর। প্রায় আধ মাইল দূরে একটি সরু ক্ষীণদর্শন সেতু দুই নগরকে স্থলপথে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেতুর উপর দিয়া জরীর ঝালর টাঙানো তাঞ্জাম, দ্রুতগতি টাঙা, রঙবেরঙের পোশাক পরিহিত পদাতিক যাতায়াত করিতেছে। নদীবক্ষে অজস্র ছোট ছোট নৌকা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল— এ কোন্ অমরাবতীতে আমাকে নিয়ে এলে সর্দার! মনে হচ্ছে যেন সেই সেকালের প্রাচীন সুন্দর ভারতবর্ষে আবার ফিরে এসেছি।

ধনঞ্জয় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন— অমরাবতী যদি ভাল করে দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন, এখনো ডাক্তার আসতে দেরি আছে।

গৌরীকে লইয়া ধনঞ্জয় প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ মাঠের মত ছাদ, কোমর পর্যন্ত উঁচু পাথরে কাজ করা প্যারাপেট দিয়া ঘেরা। চারিকোণে চারিটি গোল মিনার বা স্তম্ভ, সরু সিঁড়ি দিয়া তাহার চূড়ায় উঠিতে হয়। দুইজনে নদীর দিকের একটা মিনারে উঠিলেন; তখন সমগ্র ঝিন্দঝড়োয়া দেশটি যেন চোখের নীচে বিছাইয়া পড়িল।

কিস্তা নদী এইস্থানে প্রায় তিনশ গজ চওড়া, যত পূর্বদিকে গিয়াছে তত বেশী চওড়া হইয়াছে। গৌরী পরপারের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওটি কি?

ওটি ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ।

শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড রাজভবন, ঝি রাজপ্রাসাদের যমজ বলিলেই হয়। চারিকোণে তেমনি চারিটি উচ্চ বুরুজ মাথা তুলিয়া আছে। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাড্ভাগ; প্রাসাদের কোল হইতে শতহস্ত প্রশস্ত সোপানসারি নদীর কিনারা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

ঘাটের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, ওদিকের রাজভবনেও আসন্ন উৎসবের হাওয়া লাগিয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক সকলেই রাজপুরীর পুরস্ত্রী-জলে নামিয়া স্নান করিতেছে; তাহারা কেহ রানীর সখী, কেহ ধাত্রী, কেহ পরিচারিকা, কেহ বা বর্ষীয়সী আত্মীয়া। যাহারা অল্পবয়সী তাহারা বুক পর্যন্ত জলে নামিয়া নিজেদের মধ্যে জল ছিটাইতেছে; অপেক্ষাকৃত প্রবীণরা তাহাদের ধমক দিতে গিয়া মুখে জলের ছিটা খাইয়া হাসিয়া ফেলিতেছে। তদপেক্ষাও যাহারা প্রাচীনা-যাহারা এ সংসারের অনেক খেলাই দেখিয়াছে তাহারা ঘাটের পৈঠায় বসিয়া ঝামা দিয়া পা ঘষিতেছে এবং চাহিয়া চাহিয়া ইহাদের রঙ্গরস দেখিতেছে। মাঝে মাঝে সুমিষ্ট কলহাস্যের উচ্ছ্বস উঠিতেছে।

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া গৌরী চারিদিক ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষে বহু দূরে পূর্বদিকে যেখানে নদী শেষ

হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল–একটা পুরোনো কেল্লা বলে মনে হচ্ছে, ঐ যে দূরে—ও জিনিসটা কি?

কেল্লাই বটে— ওর নাম হচ্ছে শক্তিগড়, প্রায় তিনশ বছর আগে ঝিন্দের শক্তি সিং তৈরি করেছিলেন। এখন শক্তিগড় আর তার সংলগ্ন জমিদারী উদিত সিংয়ের খাস সম্পত্তি। স্বৰ্গীয় মহারাজ ভাস্কর সিং বাবুয়ান হিসেবে ঐ সম্পত্তি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেছেন।

বাবুয়ান কাকে বলে?

রাজার ছোট ছেলেরা, যাঁদের গদিতে বসবার অধিকার নেই, তাঁরা উচিত মর্যাদার সঙ্গে থাকবার জন্য কিছু কিছু সম্পত্তি পেয়ে থাকেন–তাকেই বাবুয়ান বলে।

উদিত বুঝে ঐখানেই থাকে?

হ্যাঁ, তা ছাড়া সিংগড়েও তার একটা বাগানবাড়ি আছে–সেখানেও মাঝে মাঝে এসে থাকে।

দেখছি ছোট ছেলেরাও একেবারে বঞ্চিত হন না!

মোটেই না। তাঁদের অবস্থা অনেক সময় বড় ছেলের চেয়ে বেশী আরামের। রাজা হবার ঝঞ্ঝাট নেই, অথচ মর্যাদা প্রায় সমান। সাধারণত দরবারের বড় বড় সম্মানের পদ তাঁরাই অধিকার করে থাকেন।

হুঁ, উদিত কোন্ পদ অধিকার করে আছেন?

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন–তিনি রাজ্যের সবচেয়ে বড় পদটা অধিকার করবার মতলবে ফিরছেন–তার চেয়ে ছোট পদে তাঁর রুচি নেই। কিন্তু সে পদের আশা তাঁকে ছাড়তে হবে, অন্তত যতদিন ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বেঁচে আছে।

গৌরী বলিল— তা তো বুঝতে পারছি কিন্তু শঙ্কর সিংয়ের কোনো খবরই কি পাওয়া গেল না?

কিছু না। তিনি একেবারে সাফ লোপাট হয়ে গেছেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে এর মধ্যে একটা ভীষণ শয়তানী লুকোনো আছে। হয়তো আর কিছু না পেয়ে উদিত তাকে গুমখুন করেছে। উদিত। আর ঐ ময়ূরবাহনটার অসাধ্য কাজ নেই।

গৌরীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল— যদি তাই হয়, তাহলে উপায়? ধনঞ্জয়ের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—যদি তাই হয়, তাহলেও উদিতকে গদিতে বসতে দেব না। সিংহাসনে উদিতের চেয়ে আপনার দাবি কোনো অংশে কম। নয়।

গৌরী স্তম্ভিত হইয়া বলিল— সে কি! আমার আবার দাবি কোথায়?

ও কথা থাক। বলিয়া ধনঞ্জয় নীচে নামিতে লাগিলেন।

নামিয়া আসিয়া দুইজনে একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ঘরটি প্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী এইখানে বসিয়া রাজা দর্শনপ্রার্থীদের দেখা দিয়া থাকেন। বিশালায়তন ঘরের চারিদিকে বহু জানালা ও দ্বার; মেঝেয় চার ইঞ্চি পুরু পারসী কার্পেট পাতা; রেশমের গদি-আঁটা। কৌচ ঘরের মধ্যে ইতস্তত সাজানো আছে। রাজার বসিবার জন্য ঘরের মধ্যস্থলে একটি সোনার কাজ-করা মখমল-ঢাকা আবলুশের চেয়ার। দেয়ালের গায়ে সূক্ষ্ম পদায় আবৃত বড় বড় ভিনীসিয় আয়না।

গৌরী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরে নকিব দ্বারের নিকট হইতে ডাক্তারের আগমন জানাইল। ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়সে প্রৌঢ়–গঙ্গানাথ দ্বারের নিকট হইতে রাজাকে সসম্ভমে অভিবাদন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন। দুই-একটা মামুলি কুশল প্রশ্নের পর গৌরীর কজিটা আঙ্গুলে টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন— বাঃ, নাড়ী তো দিব্যি চলছে দেখছি, আমার চিকিৎসার গুণ আছে বলতে হবে। বলিয়া নিজের গুঢ় কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। গৌরী ও ধনঞ্জয় মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ডাক্তার বলিলেন— এবার জিভ দেখি— গৌরী জিভ বাহির করিল। — চমৎকার! চমৎকার! লিভারটাও একবার দেখা দরকার। লিভার পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখে

সন্দেহের ছাপ পড়িল— আপনার এত ভাল স্বাস্থ্য আমি অনেক দিন দেখিনি। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন— ও জিনিসটা কি সত্যিই ছেড়েছেন নাকি?

গৌরী মুখখানা ম্রিয়মাণ করিয়া বলিল—-হ্যাঁ ডাক্তার, ও বিষ আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। ডাক্তার সানন্দে দুই করতল ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন— বেশ বেশ, আমি বরাবরই বলে আসছি ও না ছাড়লে আপনার শরীর শোধরাবে না কিন্তু এতটা উন্নতি আমি প্রত্যাশা করিনি; এ হাওয়া বানোর গুণ!

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে বলিলেন— তাতে আর সন্দেহ কি? ডাক্তারকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া ধনঞ্জয় চুপি চুপি বলিলেন— কথাটা যেন প্রকাশ না হয় ডাক্তার, তুমি তো সব জানোই। এবার কুমারকে বাংলাদেশ থেকে ধরে এনেছি।

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন–কি, বাংলাদেশে গিয়ে উনি এত ভাল ছিলেন? সেখানে যে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া!

ধনঞ্জয় বলিলেন— ভাল যে ছিলেন তা তো দেখতেই পাচ্ছ। যাহোক, উনি এতদিন তোমার চিকিৎসাধীনে এখানেই ছিলেন একথা যেন ভুলো না।

তা কি ভুলি? বলিয়া ডাক্তার গৌরীকে তাহার পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যের জন্য বহু অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এবং নিজের চিকিৎসার আশ্চর্য গুণ সম্বন্ধে পুনশ্চ রসিকতা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌরী ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিল— ডাক্তার সব কথা বুঝি জানে না? ধনঞ্জয় মৃদুহাস্যে বলিলেন— না, গঙ্গানাথ খুব উঁচুদরের ডাক্তার, কিন্তু বড় বেশী কথা কয়। যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই ওকে বলা হয়েছে। তারপর গৌরীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন— সাবাস! ডাক্তার যখন জাল ধরতে পারেনি, তখন আর ভয় নেই।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— আসল কথাটা কে কে জানে?

আমি, দেওয়ান বজ্রপাণি ও রুদ্ররূপ।ধনঞ্জয়ের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে রুদ্ররূপ উত্তেজিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া চাপা গলায় বলিল— হুঁশিয়ার, কুমার উদিত আসছেন–বলিয়া আবার পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বেশী কথা বলবেন না, যা বলবার আমিই বলব–গৌরীর কানে কানে এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয় জানালার কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িল। এইবার সত্যকার পরীক্ষা।

নকিব নাম ডাকিবার পূর্বেই উদিত দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে পদ সরাইয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিস্পলক দৃষ্টিতে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ফাঁদে পড়িবার ভয়ে সন্দিগ্ধ শ্বাপদ যেমন এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়, তেমনিভাবে উদিত ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। অবিশ্বাস, বিস্ময় ও উত্তেজনায় তাহার সুশ্রী মুখখানা বিকৃত দেখাইতে লাগিল।

নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এমনিভাবে সে গৌরীর মুখের প্রতি তাকাইয়া। রহিল। সংশয়পূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখখানা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গৌরীও দুই চক্ষে বিদ্রোহ ভরিয়া উদিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিয়া গেল।

ধনঞ্জয়ের অনুচ্চ কণ্ঠের হাসি এই নিস্তব্ধতার জাল ছিড়িয়া দিল। তিনি বলিলেন— একেই বলে ভালবাসা! আপনি আরোগ্য হয়ে উঠেছেন দেখে কুমার উদিতের হৃদয় এতই পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। অভিবাদন করতেও সা ভুলে গেছেন। বসূতে আজ্ঞা হোক কুমার!

ধনঞ্জয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদিত গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার ডান হাতখানা লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। অস্পষ্ট কণ্ঠে মামুলি দুই-একটা আনন্দসূচক শিষ্ট কথা বলিয়া অভিভূতের মত কৌচে গিয়া বসিল।

গৌরী ইতিমধ্যে নিজেকে বেশ সামলাইয়া লইয়াছিল; তাহার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ভর করিল। সে বলিল— ধনঞ্জয়, ভাই আমার সাত সকালে ব্যস্ত হয়ে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন শীঘ্র ওঁর জন্যে গরম সরবতের ব্যবস্থা কর।–কি করব আমার উপায় নেই, ডাক্তারের মানা, নইলে আমিও এই সঙ্গে এক চুমুক খেতুম।

উদিতের মনে হইল যেন তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কেবল গৌরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও বলিতে পারিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— উদিত, তুমি কি একলা এসেছ ভাই? সঙ্গে কি কেউ নেই?

উদিত জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল—ময়ূরবাহন এসেছে— বাইরে আছে।

গৌরী আগ্রহ দেখাইয়া বলিল— বাইরে কেন? এখানে নিয়ে এলেই তো পারতে— ময়ূরবাহন বুঝি এল না? বড় লাজুক কিনা— আর, লজ্জা হবারই কথা কত মদ যে আমাকে গিলিয়েছে তার কি ঠিকানা আছে! ভাগ্যে সময়ে সামলে নিয়েছি, নইলে তুমিই তো সিংহাসনে বসতে উদিত! লিভার পেকে উঠলে আর কি প্রাণে বাঁচতাম!

উদিত নিজের চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–এবার আমি উঠি। আমি একবার আমাকে একবার শক্তিগড়ে যেতে হবে

ধনঞ্জয়ের চোখে নষ্টামি নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন–তা কি কখনো হয়! কাল বাদে পরশু অভিষেক, আপনার সঙ্গে কত পরামর্শ রয়েছে, আর আপনি এখনি চলে যাবেন? লোকে দেখলেই বা মনে করবে কি? ভাববে আপনার বুঝি দাদার অভিষেকে মত নেই। তাছাড়া আপনার সরবৎ এল বলে, না খেয়ে গেলে রাজাকে অপমান করা হবে যে! বসুন—বসুন। অভিষেক সভা সাজানো হচ্ছে–সেদিকে গিয়েছিলেন নাকি!

নিরুপায় উদিত ধনঞ্জয়ের দিকে একটা বিষদৃষ্টি হানিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন— অভিষেকের কি বিধিব্যবস্থা হয়েছে আপনি তো সবই জানেন—আপনাকে আর বেশী কি বলব? সকালবেলা পঞ্চতীর্থের জলে স্নান করে রাজবংশীয় সমস্ত জহরৎ পরে রাজা অভিষেক সভায় গিয়ে হোমে বসবেন। সেখানে তিন ঘণ্টা লাগবে। হোম শেষ করে পুরোহিতের আঙ্গুলের রক্ত-টীকা পরে রাজা বাইরে আসবেন। তখন অভিষেক সম্পন্ন করে শোভাযাত্রা আরম্ভ হবে। রাজা প্রথম হাতির ওপর সোনার হাওদায় থাকবেন তার পরের হাতিতে রূপার হাওদায় আপনি থাকবেন। সবসুদ্ধ দেড়শ হাতি আর ছয়শ ঘোড়া শোভাযাত্রায় থাকবে। নগর পরিভ্রমণ করে ফিরে আসবার পর দরবার বসবে। দরবারে প্রথমেই ঝড়োয়ার রাজকুমারীর সঙ্গে রাজার তিলক হবে— ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেব অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে স্বয়ং তিলক দিতে আসবেন। তিলক শেষ হলে ভারত-সম্রাটের অভিনন্দন পত্র ও আর আর রাজরাজড়াদের অভিনন্দন পাঠ করা হবে। তারপর মহারাজ সভা ভঙ্গ করে বিশ্রামের জন্য অন্দরে প্রবেশ করবেন।

এদিকে রাজ্যময় উৎসবের আয়োজন হয়েছে সে তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। শহরের প্রত্যেক বাড়িটি ফুল পতাকা পূর্ণকুম্ভ দিয়ে সাজানো হবে, যারা তা পারবে না সরকারী খরচে তাদের বাড়ি সাজিয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত দিন খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ, মল্লযুদ্ধ, বাঈজীর নাচ, হাতির লড়াই চলবে। সন্ধ্যার পর নদীতে নৌবিহার হবে।

শহরে নাচ-গান, দেয়ালী বাজি সমস্ত রাত চলবে। সাত দিন ধরে শহর এমনি সরগরম হয়ে থাকবে।

উদিতের মুখ উত্তরোত্তর কালীবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে হয়তো আর সহ্য করিতে না পারিয়া একটা বেফাঁস কিছু করিয়া ফেলিত কিন্তু এই সময় ভৃত্য সোনার থালার উপর কাচের পূর্ণ পানপাত্র বহন করিয়া উপস্থিত হইল।

পানপাত্র উদিতের হাতে দিয়া গৌরী বলিল— এই নাও উদিত, খাও। আমারও লোভ হচ্ছে— কিন্তু আমি খাব না। সংযমী হওয়াই মনুষ্যত্ব। উদিত এক চুমুকে পাত্র শেষ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মদের প্রভাবে তাহার হতবুদ্ধি ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল— আপনার অসুখের সময় আমাকে মহলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কেন?

গৌরী নিরুপায়ভাবে হাত নাড়িয়া বলিল— ডাক্তারের মানা উদিত, ডাক্তারের মানা। গঙ্গানাথ কি রকম দুর্দান্ত লোক জান তো? একেবারে হুকুম জারি করে দিলে কারুর সঙ্গে দেখা করতে পাব না।

ধনঞ্জয় বলিলেন–কিন্তু এমনি ভ্রাতৃভক্তি কুমার উদিতের উনি প্রত্যহ একবার করে আপনার খোঁজ নিয়ে গেছেন।

স্নেহবিগলিতকণ্ঠে গৌরী বলিল— ভাইয়ের চেয়ে আপনার আর কে আছে বল? কিন্তু তবু এমন পাজি দেশের লোক, উদিতের নামেও মিথ্যে দুর্নাম দেয় বলে ও নাকি আমার বদলে সিংহাসনে বসতে চায়। বল তো উদিত-কত বড় মিথ্যে কথা!

হঠাৎ চাপা গলায় উদিত গর্জন করিয়া উঠিল— তুমি কে?

অতি বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল— আমি কে? উদিত, উদিত, তুমি কি বলছ? আজকাল কি সকালবেলা মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দিয়েছ! আমাকে চিনতে পারছ না! ধনঞ্জয়, দেখছ। উদিতের মুখ কি রকম লাল হয়ে উঠেছে! এখনি গঙ্গানাথকে ডাকা দরকার!

রুদ্ররূপকে ডাকিয়া ধনঞ্জয় হুকুম দিলেন কুমার উদিত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র গঙ্গানাথকে ডেকে পাঠাও।

অসীম বলে নিজেকে সংযত করিয়া উদিত দাঁতের ভিতর হইতে বলিল–থাক, ডাক্তারের দরকার নেই। আচ্ছা চললাম, আবার দেখা হবে। বলিয়া রাজার দিকে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া। উদিত সিং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিলেন; রুদ্ররূপ প্রস্থান করিলৈ গৌরীর নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন—গোড়াতেই উদিতকে এতটা ঘাঁটানো ঠিক হয়নি। একটু চেপে চললেই হত। তা যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

গৌরী বলিল— শত্রুতা করতে হলে ভাল করে করাই ঠিক, আধমনা হয়ে শত্রুতা করা বোকামি। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? উদিত বুঝতে পেরেছে?

ধনঞ্জয় ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন— না, বুঝতে পারেনি ঠিক, কিন্তু বেজায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। এর ভেতর কিছু কথা আছে, ভ্যাবাচাকা খেলে কেন?

গৌরী বলিল— শঙ্কর সিংকে খুন করেনি তো?

ধনঞ্জয় বলিলেন–না, খুন বোধ হয় করেনি। খুন করলে আপনাকে দেখবামাত্র জাল রাজা বলে বুঝতে পারত। তাই তো! উদিত অমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল কেন? বলিয়া ধনঞ্জয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

তারপর দেশের বহু গণ্যমান্য লোককে দর্শন দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। কোনো কিছু ঘটিল না, সকলেই রাজার রোগমুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীর দিকের একটা ভোলা বারান্দায় সিল্কের নরম গালিচা পাতা হইয়াছিল; তাহার উপর মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়া গৌরী সোনার আলবোলায় তামাক টানিতেছিল। ধনঞ্জয় তাহার সম্মুখে পা মুড়িয়া বসিয়াছিলেন।

আকাশে আধখানা চাঁদ সবেমাত্র নিজের রশ্মিজাল পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস যদিও মাঝে মাঝে শরীরে একটু কাঁপন ধরাইয়া দিতেছে, তবু এ মনোরম স্থানটি ছাড়িয়া গৌরী উঠিতে পারিতেছিল না। নদীর পরপারে ঝড়োয়ার রাজবাড়িতে আলো জ্বলিয়া উঠিল, একে একে সব বাতায়নগুলি আলোকিত হইল— নদীর জলে সেই ছায়া কাঁপিতে লাগিল। দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

একবার খড়ম পায়ে দিয়া বৃদ্ধ বজ্রপাণি দুই-একটা প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে গৌরী বলিল, আচ্ছা, বুড়ো মন্ত্রী এত কাজ করছেন, আর তুমি তো দিব্যি আমার কাছে বসে আড্ডা দিচ্ছ?

ধনঞ্জয় বলিলেন— আড্ডা দিচ্ছি এবং আরো দুদিন দেব। অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে চোখের আড়াল করছি না। শঙ্কর সিং তো গেছে, শেষে আপনাকেও খোয়ব নাকি?

আমারও খোয়া যাবার ভয় আছে নাকি?

বিলক্ষণ আছে। আসলই যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন নকল হারাতে কতক্ষণ?

গৌরী গম্ভীর হইয়া বলিল— সত্যি? শঙ্কর সিংয়ের কি কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না?

কিছু না, যেন কপূরের মত উবে গেছেন। অন্য অন্য বারেও খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়েছে বটে, কিন্তু এরকমটা কোনো বার হয়নি। সন্দেহ হচ্ছে সত্যি সত্যিই গুমখুন করলে না তো? তা যদি করে থাকে—

রুদ্ররূপ প্রবেশ করিল। চাঁদের আলো ছিল বলিয়া অন্য আলো ইচ্ছা করিয়াই রাখা হয় নাই, ধনঞ্জয় ঠাহর করিয়া বলিলেন–রুদ্ররূপ নাকি? এস, কোনো খবর পেলে?

রুদ্ররূপ উভয়কে অভিবাদন করিয়া গালিচার উপর পা মুড়িয়া বসিল। চম্পা রুদ্ররূপকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন— চম্পা, রাজার জন্যে পান আনতে বল তো মা!

চম্পা প্রস্থান করিল। তখন রুদ্ররূপ বলিল— কুমার উদিত আর ময়ূরবাহন এখান থেকে বেরিয়ে সটান ঘোড়া ছুটিয়ে শক্তিগড়ে গিয়েছেন, পথে কোথাও থামেননি। এইমাত্র খবর নিয়ে লোক ফিরে এসেছে।

ধনঞ্জয় হঠাৎ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন–ওঃ! ওঃ! কি আহাম্মক আমি কি নালায়েক আমি! এটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি!

গৌরী আশ্চর্য হইয়া বলিল–কি বুঝতে পারনি?

ধনঞ্জয় বলিলেন–ইচ্ছে করে আমায় ভুল খবর দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল। ঐ শয়তান স্টেশনমাস্টারটা উদিতের দলে—ও-ই আমাকে বলেছিল যে কুমার শঙ্করকে ছদ্মবেশে মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে চড়তে দেখেছে। এখন সব বুঝতে পারছি।

কিন্তু আমি যে এখনো কিছুই বুঝলাম না।

বুঝলেন না? শঙ্কর সিংকে শক্তিগড়ে বন্ধ করে রেখেছে। দেশে থাকলে পাছে আমি জানতে পারি তাই মিথ্যে খবর দিয়ে আমাকে সরিয়েছিল। এ ঐ হাড়বজ্জাত ময়ূরবাহনটার বুদ্ধি।

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে রুদ্ররূপ দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল–কিন্তু তা যদি হয় তাহলে শক্তিগড়ে তল্লাস করলেই তো–

শক্তিগড় উদিতের নিজের জমিদারী–সেখানে সে আমাদের ঢুকতে দেবে না।

ফৌজ নিয়ে যদি–

পাগল। জোর করে যদি শক্তিগড়ে ঢুকি তাতে বিপরীত ফল হবে। উদিত সিং বমাল সমেত ধরা দেবে ভেবেছ? তার আগে শঙ্কর সিংহকে কেটে কিস্তার জলে ভাসিয়া দেবে।

আবার দীর্ঘকাল সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ধনঞ্জয় বলিলেন না, এখন আর কিছু হবে না–সময় নেই। অভিষেক হয়ে যাক— তারপর–। রুদ্ররূপ, তুমি এখানে থাকো, আমি একবার মন্ত্রীর কাছে চললাম। যতক্ষণ না ফিরি এঁকে ছেড়ো না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নৌ-বিহার

রাজ-অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

দিনের অনুষ্ঠান ও তাহার আনুষঙ্গিক সমারোহ শেষ হইয়া যাইবার পর রাত্রির আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কিস্তার জল হাজার হাজার সুসজ্জিত নৌকায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নৌকাটি সারি সারি বেলোয়ারি ঝড়ের রঙীন আলোয় ঝকমক করিতেছে। কোনো নৌকায় সারঙ্গী তবলা সহযোগে কলকণ্ঠী ললনার গান চলিতেছে। কোনো নৌকার ছাদ হইতে আতসবাজি আকাশে উঠিয়া নানা বর্ণের উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ডে ফাটিয়া পড়িতেছে। কোনো নৌকা হাঙ্গরমুখ, কোনো নৌকা ময়ুরপঙ্খী। কোনোটি পালের ভারে মন্থর মরাল-গতিতে চলিতেছে, কোনোটি মাল্লার দাঁড়ের আঘাতে জল মথিত করিয়া ঘুরিতেছে। প্রায় সকল নৌকাই দুই রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, যেন এই সম্মোহন বৃত্ত ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। দুই তীরে দুই রাজসৌধ সর্বাঙ্গে আলোকমালা পরিধান করিয়া যেন ঔজ্জ্বল্যের, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরকে সকৌতুকে আহ্বান করিতেছে।

একটি বজরাকে সকলেই সসম্ভ্রমে দূরে দূরে রাখিয়াছে; একটি করিয়া লাল ও একটি করিয়া সবুজ আলোর ঝালর দেখিয়া বুঝা যায় এটি রাজবজরা। নৌকাটি ফুলপাতা, জরি,

মখমল ও জহরৎ দিয়া সুন্দরভাবে সাজানো। তাহার পশ্চাতে রূপার ডাণ্ডার মাথায় ঝিন্দের রাজপতাকা উড়িতেছে।

নৌকার ছাদের উপর মখমলের চাঁদোয়ার নীচে তাকিয়া ঠেস দিয়া নবাভিষিক্ত রাজা বসিয়া আছেন, সঙ্গে মন্ত্রী বজ্রপাণি, সর্দার ধনঞ্জয় এবং রুদ্ররূপ। বাহিরের লোক এখানে কেহই নাইমাঝি-মাল্লারা সব নীচে। কিন্তু তবু সকলেই নীরব—কিছু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দুই-একটা কথা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন–আমি শুধু উদিতের মুখখানার কথা ভাবছি। যখন ইংলণ্ডেশ্বরের অভিনন্দন পড়া হচ্ছে, তখন তার মুখ দেখেছিলে? আমার ভয় হচ্ছিল একটা বিশ্রী কাণ্ড বুঝি বাধিয়ে বসে।

ধনঞ্জয় বলিলেন–হুঁ, আর ঐ ময়ূরবাহনটা। তিলকের সময় এমনভাবে চেঁচিয়ে হেসে উঠল, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সভা থেকে গলা টিপে বার করে দিই। শুধু একটা কেলেঙ্কারি হবে এই ভয়ে পারলাম না।

ভার্গব বলিলেন–ওরা এমনি ছাড়বে না, শীঘ্রই একটা কিছু করবে। আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার।

উদিত ও ময়ূরবাহন মিলিয়া যে একটা কিছু করিবেই, সে সম্বন্ধে তিনজনের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না; কিন্তু কি করিবে, কোন্ দিক হইতে আক্রমণ করিবে— সেইটাই কেহ ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

গৌরী সেই প্রশ্নই করিল–কি করতে পারে ওরা?

বজ্রপাণি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—সেটা জানা থাকলে আগে থাকতে তার প্রতিকার করা যেত। এখন সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। রাজ বজরার ত্রিশ গজের মধ্যে অন্য কোনো নৌকা ছিল, কিন্তু মধুপাত্রের চারিপাশে মক্ষিকার মত সকল নৌকাই রাজ-নৌকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল। অলক্ষিতে ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, এমন কি দাঁড়টানার ছপ্ ছ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নর্তকীর পায়জনিয়ার নিক্কণও শুনা যাইতেছিল।

চতুঃপ্রহরব্যাপী উৎসবের পর নানাবিধ ভাবনা ও উত্তেজনার ফলে গৌরী ঈষৎ ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল— সে তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ঝড়োয়ার আলোকদীপ্ত প্রাসাদের মাথায় নবমীর চাঁদ স্থির হইয়া আছে–সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল– আচ্ছা দেওয়ানজি, যাঁর সঙ্গে আজ আমার পাকা দেখা অথাৎ তিলক হল, তিনি দেখতে কেমন?

ভার্গব গম্ভীরমুখে বলিলেন–রানীর মত। এর বেশী আমাদের বলতে নেই, তিনি একদিন আমাদের মা হবেন।

গৌরী হাসিয়া বলিল— তা যেন বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি–এই যে তাঁর তিলক হল আমার সঙ্গে, অথচ বিয়ে হবে আর একজনের সঙ্গে এতে আপনাদের শাস্ত্রমতে কোনো দোষ হবে না?

বজ্রপাণি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধনঞ্জয়ের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; এই চিন্তাটাই তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী ক্লেশ দিতেছিল। ঝিন্দের পাটরানী যে ধর্মত একজনের বাগদত্তা হইয়া পরে রাজার মহিষী হইবেন, সমস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই ব্যাপারটাই ধনঞ্জয়ের সবচেয়ে অরুচিকর ঠেকিতেছিল। কঠিনপ্রাণ যোদ্ধার মত তিনি ভালর সঙ্গে মন্দটাও গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ ছিল না।

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন তিনি এসব কিছু জানতে পারবেন না।

গৌরী বলিল— তা ঠিক, মনের অগোচরে পাপ নেই। তা সে যাক, বিয়েটা কতদিন পরে হবে, কিছু ঠিক হয়েছে কি?

বজ্রপাণি বলিলেন–তার এখনো দুমাস দেরি আছে।

গৌরী প্রশ্ন করিল–কিন্তু এই দুমাসে শঙ্কর সিংকে যদি উদ্ধার না করা যায়, তাহলে বিয়েটাও কি বকলমে আমাকে করতে হবে নাকি? বলিয়া সকৌতুকে গৌরী তিনজনের মুখের পানে চাহিল।

সহসা এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিল না। ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া কার্পেটের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। রুদ্ররূপ উদাসীনভাবে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ভার্গব একটিপ নস্য লইয়া কি একটা বলিবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় বজরার ভিতর হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—সামাল, হুঁশিয়ার!

তারপর মুহূর্তমধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। গৌরী সচকিতে উঠিয়া বসিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, একখানা সরু ছুঁচোলো নৌকা সমস্ত আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে টর্পেডোর মত তাহার বজরার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে ধাক্কা লাগিতে আর দেরি নাই, মধ্যে মাত্র বিশ হাতের তফাৎ। নৌকার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিয়া লইতে গৌরীর তিলার্ধ সময় লাগিল না; সে একলাফে উঠিয়া বজরার ধারে চাঁদির রেলিং ধরিয়া হাঁকিল খবরদার! তফাৎ যাও।

উত্তরে অন্ধকার নৌকার ভিতর হইতে একটা উচ্চকণ্ঠের হাসির আওয়াজ আসিল। পরমুহূর্তেই বজরা ও নৌকার ভীষণ সজ্ঘাতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বজরার সমস্ত ঝাড়লণ্ঠনগুলা ঠোকাঠুকি হইয়া ঝঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া নিভিয়া গেল এবং বজরাখানা ভয়ঙ্কর একটা টাল খাইয়া প্রায় কাত হইয়া পড়িল। সেই অন্ধকারের মধ্যে গৌরী অনুভব করিল—জ্যা-মুক্ত তীরের মত সে শুন্যে উড়িতে উড়িতে চলিয়াছে।

শুনা যায়, আকস্মিক বিপৎপাতে মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পাইয়া কেবল প্রাণরক্ষার চেষ্টাই জাগ্রত থাকে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এইরূপ উড্ডীমান অবস্থাতেও গৌরী যে কথাটা ভাবিতেছিল, আসন্ন জীবন-মৃত্যু সঙ্কটের সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। সে ভাবিতেছিল, ঐ যে হাসিটা খট্টাসের ডাকের মত এখনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ঐ হাসি সে পূর্বে কোথায় শুনিয়াছে?

এই ভাবিতে ভাবিতে বজরা হইতে বিশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াই গৌরী কিস্তার জলে তলাইয়া গেল। হঠাৎ ককনে ঠাণ্ডা জলে এই অতর্কিতে অবগাহনের ফলে গৌরীর মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া মনে হইল, এইবার তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে ভাল সাঁতার জানিত বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল না, কোনো রকমে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে জল কাটিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। পতনের বেগে সে বহুদূর নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাই উঠিতে দেরি হইল। প্রায় আধ মিনিট পরে ভাসিয়া উঠিয়া দীর্ঘ এক নিশ্বাস টানিয়া চোখ মেলিল।

চোখ মেলিয়াই কিন্তু আবার তাহাকে ডুব মারিতে হইল। ইতিমধ্যে রাজবজরায় দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া চারিদিক হইতে নৌকাসকল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল বজরা ঘিরিয়া ভীষণ চেঁচামেচি ও হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছিল। গৌরী মাথা তুলিয়াই দেখিল— একখানা প্রকাণ্ড নৌকা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। সে সজোরে নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

ডুব-সাঁতার দিয়া খানিকটা দূর গিয়া আবার সে ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল– কিন্তু মাথা তুলিতে পারিল না, একখানা নৌকার তলায় মাথা ঠুকিয়া গেল। গৌরীর মনে হইল, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, বায়ুর অভাবে ফুসফুস এখনি ফাটিয়া যাইবে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে আরো কিছুদুর গিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও নৌকার তলায় মাথা লাগিয়া তাহাকে মাথা জাগাইতে দিল না।

গৌরী তখন নৌকার তলদেশ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল— কোথাও না কোথাও নৌকার তলা শেষ হইয়াছে নিশ্চয়, সেইখানে গিয়া মাথা জাগাইবে এই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু এদিকে ফুসফুসের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে–সংজ্ঞাও প্রায় লুপ্ত। সেই অর্ধচেতনার মধ্যে মনে হইতেছে, বুঝি নৌকার কিনারা আর মিলিবে না।

কতক্ষণ এইভাবে চলিবার পর হঠাৎ কিনারা মিলিল। দুইটা নৌকা ঠেকাঠেকি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের হালের দিকে সামান্য একটু ত্রিকোণ স্থান। সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে গলা পর্যন্ত জাগাইয়া, প্রায় এক মিনিট ধরিয়া দীর্ঘ কম্পমান কয়েকটা নিশ্বাস টানিবার পর গৌরীর মাথাটা কিছু পরিষ্কার হইল। কিন্তু বিপদ তখনো শেষ হয় নাই। গৌরী চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, যতদূর দেখা যায়, অগণ্য অসংখ্য নৌকা ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রত্যেক নৌকার আরোহী একযোগে অর্থহীন চিৎকার করিতেছে। গৌরীও চিৎকার করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইল না।

গৌরী একবার ভাবিল, নৌকার পার্শ্ব ধরিয়া ঝুলিয়া থাকি কখনো না কখনো উদ্ধার পাইব। কিন্তু তাহাতেও ভয় আছে; নৌকাগুলা স্রোতের বেগে দুলিতেছে, পরস্পর ঘর্ষিত হইতেছে। যদি কোনোক্রমে মাথাটা দুই নৌকার জাঁতাকলে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে গুঁড়াইয়া একেবারে ছাতু হইয়া যাইবে। সুতরাং ঝুলিয়া থাকাও দীর্ঘকালের জন্য নিরাপদ নয়।

মিনিট পাঁচেক পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া গৌরী স্থির করিল এই নৌকার ভিড়ের বাহিরে যাইতে হইবে। নৌকার ভিড় রাজবজরার নিকটেই বেশী, অতএব বজরা হইতে যতদূর যাওয়া যায়, ততই নিরাপদ। গৌরী তখন ভাল করিয়া একবার দিক-নির্ণয় করিয়া লইয়া আবার ডুব মারিল। নৌকাগুলার হাল যেদিকে সেইদিকেই মুক্তির পথ, এই বুঝিয়া সে প্রাণপণে ডুব-সাঁতার কাটিয়া চলিল।

প্রায় বিশ গজ সাঁতার দিয়া সে আবার ভাসিয়া উঠিল। হাঁ, অনেকটা ফাঁকা আছে। নৌকার ভিড় আছে বটে, কিন্তু অতটা ঘনীভূত নয়। আপাতত ডুব-সাঁতার দিবার আর কোনো প্রয়োজন নাই।

সকল নৌকাতেই আলো আছে কিন্তু সে আলো শোভার জন্য, মজ্জমানকে পথ দেখাইবার জন্য নয়। কিস্তার জল অন্ধকার। গৌরী দুই-একটা নৌকার আরোহীদের ডাকিবার চেষ্টা করিয়া ক্লান্তিবশত বিরত হইল। কেহ তাহার ডাক শুনিতে পায় না, সকলেরই বাহেন্দ্রিয় দূরে বজরাটার উপর নিবদ্ধ।

গৌরী তখন তীরের দিকে চক্ষু ফিরাইল। দূরে— কত দূরে তাহা ঠিক আন্দাজ হয় না— নদীর কুল হইতে উচ্চ প্রাসাদের মূল পর্যন্ত সারি সারি শুভ্র সোপান উঠিয়া গিয়াছে— যেন কোনো স্বপ্নদৃষ্ট দৈত্যপুরী। ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ থাকিয়া গৌরীর সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল, সে ঐ দৈত্যপুরী লক্ষ্য করিয়া ক্লান্তভাবে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

ঘাটের আরো কাছে যখন পৌঁছিল তখন চাঁদের ফিকা আলোয় তাহার মনে হইল, যেন ঘাটের শেষ পৈঠার উপর সারি সারি কাহারা দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীর হাত-পা তখন শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি ধোঁয়া-ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে —ঘাটে পৌঁছিতে আর কত দেরি!

না, আর চলে না, দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া কি বলিল। কি বলিল?–একটু—আর একটু বাকি। এইটুকু সাঁতার কেটে এস! কাহার গলা? অচলবৌদির না? তবে এটুকু যেমন করিয়া হউক যাইতেই হবে।

প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৌরী জল হইতে সোপানের উপর উঠিল। তারপর একজনের কুঙ্কুম-চর্চিত পায়ের নিকট মাথা রাখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

–রমণীগণ মুকুটমণি—

মূর্ছা ভাঙিতেই গৌরী সটান উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া বলিল— মনে পড়েছে ময়ূরবাহনের হাসি। তারপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল।

দেখিল, সে মেঝের উপর বসিয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া একপাল সুন্দরী উৎসুক কৌতূহলীনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে তরুণীটির কোলে মাথা রাখিয়া সে এতক্ষণ শুইয়া ছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একজনকে মৃদুস্বরে বলিল–খবর দে।

গৌরী বলিল—ব্যাপার কি? এ আমি কোথায়?

ক্রোড়দায়িনী তরুণী চপল হাসিয়া বলিল— আপনি স্বর্গে এসেছেন। কিস্তার জলে ডুবে গিয়েছিলেন মনে নেই?

গৌরী বলিল— তা হবে। আপনারা সব কারা?

তরুণী বলিল— আমরা সব অপ্সরী। একটি ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডলা রক্তাধরা অষ্টাদশী মোহিনীকে দেখাইয়া বলিল— ইনি হচ্ছেন উর্বশী। আর একটিকে দেখাইয়া–ইনি মেনকা। আর আমি—আমি রম্ভা।

গৌরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল— কাঁচা না পাকা?

যুবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল— আপনিই বিচার করে বলুন দেখি? বলিয়া গৌরীর সম্মুখে বসিয়া নিজের সহাস্য মুখখানি গৌরীর চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

গৌরীও জহুরীর মত ভাল করিয়া পরখ করিয়া বলিল—হুঁ, নেহাৎ কাঁচা বলা চলে না, দিব্যি রঙ ধরেছে।

এমন সময় সুন্দরীচক্রের বাহির হইতে একজন বলিল— আঃ–লছমি, কি বেহায়াপনা করছিস? তোরা সব সরে যা।

সকলে সরিয়া গেলে একটি তন্বী বাঁ হাতের উপর শুষ্ক জামা কাপড় ও তোয়ালে লইয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন?

গৌরী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল— আপনি কি তিলোত্তমা?

তন্বী বলিল না, আমি কৃষ্ণা। কিন্তু পরিচয় পরে হবে; এখন উঠুন, ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন।

এতক্ষণে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরী লজ্জায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। মুক্তার বুটিদার ঢিল-হাতার রেশমী পাঞ্জাবি জলে ভিজিয়া গায়ের সহিত একেবারে সাঁটিয়া গিয়াছে, নিম্নাঙ্গের পট্টবস্ত্রও তথৈবচ। সে জড়সড় হইয়া বলিল—এঁদের সরে যেতে বলুন।

কৃষ্ণা সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোরা বেররা এখান থেকে।

সকলে প্রস্থান করিল, বেহায়া তরুণীটি যাইতে যাইতে বলিল— আচ্ছা, আমরা আসছি আবার, পেয়েছি যখন সহজে ছাড়ছি না।

কৃষ্ণা কাপড়গুলা গৌরীর কাছে রাখিয়া বলিল— আমাদের মহলে পুরুষের পাট নেই, তাই পুরুষের কাপড় জোগাড় করা গেল না। এগুলো সব কস্তুরীর। পরে দেখুন, স্বস্তি যদি বা না পান, সুখ পাবেন নিশ্চয়! বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল।

কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে গৌরীর বাকি ছিল না। সে মনে মনে ভারি একটা কৌতুকপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ঝড়োয়ার পুর-ললনাদের এই অসঙ্কোচ রঙ্গ-তামাসা তাহার মনকে যেন এক নূতন রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে ভাবিল যুবক-যুবতীদের মধ্যে এমন সুন্দর এমন অবাধ স্বচ্ছন্দ মেলামেশা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। গৌরী বিবাহিত হইলে বুঝিতে পারিত, বিবাহের রাত্রে নূতন বরকে লইয়া ঠিক অনুরূপ ব্যাপার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঘটিয়া থাকে এবং নূতন জামাইয়ের সম্মুখে ঘোমটা ও পর্দা বাঙালীর অন্তঃপুর হইতেও নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কাপড় তুলিয়া লইয়া গৌরী দেখিল— সেখানা ছয় ইঞ্চি চওড়া পাড়যুক্ত ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি। মনে মনে হাসিয়া গৌরী সেখানা পরিধান করিল। কিন্তু জামা পরিতে গিয়াই লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি, কৃষ্ণা যে বলিয়াছিল স্বস্তি না পান সুখ পাবেন— তার অর্থ এই! গৌরী তাড়তাড়ি সেটাকে তোয়ালে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। মনে মনে একটু রাগও হইল। কৃষ্ণা বাহিরে বেশ ভালমানুষটি, লছমির মত চপলা নয়, কিন্তু ভিতরে তাহার এত কুবুদ্ধি! দাঁড়াও, তাহাকে জব্দ করিতে হইবে।

উত্তরীয়খানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইতেই কৃষ্ণা পুনঃপ্রবেশ করিল, বলিল— হয়েছে? এবার আসুন আমার সঙ্গে।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যেতে হবে?

কৃষ্ণা বলিল— আমি যেখানে নিয়ে যাব। অত কৌতূহল কেন?

গৌরী বলিল—বেশ চল। তোমার শাস্তি কিন্তু ভোলা রইল।

নিরীহভাবে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল— শাস্তি কিসের?

গৌরীও পাল্টা জবাব দিল অত-কৌতূহল কেন? শাস্তি যখন পাবে তার কারণও জানতে পারবে।

কৃষ্ণা গৌরীকে মর্মরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে লইয়া চলিল, সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল— কি হয়েছিল বলুন তো? আমরা সবাই ঘাটে দাঁড়িয়ে জল-বিহার দেখছিলাম, এমন সময় একটা ভারি গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই আপনি ভাসতে ভাসতে আমাদের ঘাটে এসে হাজির। হলেন।

গৌরী বলিল— কি যে হয়েছিল সেটা আমি এখনো ভাল রকম বুঝতে পারিনি। বাঁটুল থেকে যেমন গুলি বেরিয়ে যায় তেমনি ছিটকে কিস্তার জলে পড়েছিলুম, এইটুকুই মনে আছে।

দ্বিতলে উঠিয়া একটা দরজার সম্মুখে কৃষ্ণা দাঁড়াইল, এক হাতে পর্দা সরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল— ভিতরে যান।

গৌরীর মনে হইল সে যেন তাহার জীবনের এক মহারহস্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল–আর তুমি?

অল্প হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল— আমিও আছি। আপনি আগে যান।

একটু ইতস্তত করিয়া গৌরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা গৌরী ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরটি প্রকাণ্ড, চমৎকারভাবে সাজানো, কিন্তু আসবাবের বাহুল্য নাই। ছাদ হইতে চারিটি বহু শাখাযুক্ত ঝড় সোনালী

জিঞ্জিরে ঘরের চারি কোণে ঝুলিতেছে। তাহাদের শাখায় শাখায় অসংখ্য দীপ। ঘরের কোণে কোণে আবলুস কাঠের তেপায়ার উপর প্রায় দুই ফুট উচ্চ পিতলের নারীমূর্তি। মূর্তিগুলি অর্ধনগ্ন, একহাতে স্খলিতবস্ত্র বুকের কাছে ধরিয়া আছে— অপর হস্তটি উর্ধ্বোত্থিত; সেই হস্তে ধৃত অর্ধস্ফুট কমলাকৃতি পাত্র হইতে মৃদু মৃদু সুগন্ধি ধূম উত্থিত হইতেছে। ঘরের মেঝেয় কোনো আস্তরণ নাই; পঙ্খের কাজের উপর নানা বর্ণের ঝিনুক বসাইয়া অপূর্ব কারুকার্য করা হইয়াছে। তিনদিকের দেয়ালে দশফুট উচ্চ দরজা ভারী মখমলের পর্দা দিয়া ঢাকা, চতুর্থ দিকে একটি বাতায়ন। বাতায়ন দিয়া কিস্তার দৃশ্য চোখে। পড়ে।

ঘরে কেহ নাই দেখিয়া গৌরী বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। পিছন ফিরিতেই দেখিল, যে-দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিয়াছে তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা হাসিতেছে এবং ঘরের ভিতরে সেই দরজারই অনতিদূরে আর একটি নারীমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে।

সেই মূর্তিটির দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য গৌরীর হৃৎস্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া গেল।

ফলফুল লতাপাতার সহিত তুলনা করিয়া সেরূপের বর্ণনা করা অসম্ভব। চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে যাওয়াও মূঢ়তা, কারণ বিশ্লেষণে শরীরটাই ধরা পড়ে রূপ ধরা পড়ে না। গৌরী নিস্পন্দবক্ষে সেই অপরূপ মূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে যেন অজন্তার একটি জীবন্ত চিত্র দেখিতেছে। তেমনি অপূর্ব ভঙ্গিতে কাপড়খানি পরা, চোলিটি তেমনি মধুর শাসনে উর্ধ্বাঙ্গের চপল লাবণ্য সংযত করিয়া রাখিয়াছে,

উত্তরীয়খানি তেমনি স্বচ্ছভাবে দেহটিকে যেন চন্দ্রকিরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, চোলি ও নীবির মধ্যবর্তী স্থানটুকু তেমনি নির্লজ্জভাবে অনাবৃত; মাথায় তেমনি বিচিত্র সুন্দর কবরীবন্ধ, হস্তে তেমনি অপরিস্ফুট লীলাকমল। গৌরী নিশ্বাস ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

জীবন্ত ছবিটির চোখ দুইটি একবার কাঁপিয়া খুলিয়া গিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নত হইয়া পড়িল।

একটি ছোট্ট হাসির শব্দে গৌরী চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। সহসা তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সে কোথায় আসিয়াছে, এ কোন্ নন্দনবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে?

কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে আসিয়া ছবির হাত ধরিয়া বলিল–দুজনেই যে চুপচাপ, চিনতে পারছ না নাকি? তা হবে, চোখের দেখা তো ইতিমধ্যে হয়নি, সেই যা আট বছর বয়সে একবার হয়েছিল। আচ্ছা, আমিই না হয় নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি–ইনি হচ্ছেন দেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিং—তোমার বর, আরইনি দেবী কস্তুরীবাঈ—আপনার রানী। আর কি—পরিচয় হয়ে গেল এবার তাহলে আমি যাই।

কস্তুরীবাঈয়ের রজনীগন্ধার কলির মত আঙুলগুলি কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল। কৃষ্ণা তখন কানে কানে বলিল— আচ্ছা, আমি যাব না, রইলাম। কিন্তু তোমার প্রভু সাঁতার কেটে আজকের দিনে। দেখা দিতে এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা কর। বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৌরীর সম্মুখে লইয়া আসিল।

গৌরী অপরাধীর মত দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে ছদ্মবেশে চোরের মত পরস্ব অপহরণ করিতেছে। এই প্রীতির রত্নাগারে প্রবেশ করিবার তাহার অধিকার নাই।

কস্তুরী গৌরীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। গৌরী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল— থাক থাক—হয়েছে।

কৃষ্ণা বিদ্যুৎচপল চক্ষে চাহিয়া বলিল— আপনি জল থেকে উঠেই ওঁর রাঙা পা-দুখানির ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েছিলেন, তাই উনি সেটা ফেরত দিলেন।

গৌরী দেখিল, কস্তুরীর গাল দুইটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, সেও দেখাদেখি অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তারপর লজ্জা দমন করিয়া সহজভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল— কি শুভক্ষণে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তা এখন বুঝতে পারছি।

কৃষ্ণা কস্তুরীর গা ঠেলিয়া বলিল–নাও জবাব দাও। আমি বার বার তোমার হয়ে কথা কইতে পারি না।

কস্তুরীর ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল, সে নত-নয়নে ধীরে ধীরে বলিল— আপনার যে আঘাত লাগেনি এই আমাদের সৌভাগ্য।

গলাটি একটু ভাঙা-ভাঙা, কথাগুলি বাধ-বাধ; কিন্তু গৌরীর মনে হইল এমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর বুঝি আর কাহারো নাই। আরো শুনিবার আশায় সে সতৃষ্ণভাবে কস্তুরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব; কস্তুরী নতমুখী, নখ দিয়া পদ্মের পাতা ছিড়িতেছে। কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিল— সব কথা ফুরিয়ে গেল? আর কথা খুঁজে পাচ্ছ না? বেশ, তাহলে এবার একটু জলযোগ হোক— আসুন।

ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর কার্পেটের আসন বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন সজ্জিত করা ছিল; মেঝের কারুকার্যের জন্য এতক্ষণ তাহা গৌরীর চোখে পড়ে নাই। সোনার থালায় ফলমূল ও মিষ্টান্ন সাজানো ছিল; গৌরী দেখিয়া আপত্তি করিয়া বলিল—এত রাত্রে আবার এ সব কেন?

কৃষ্ণা বলিল— রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বসুন, রাত্রির আহারটা না হয় এখানেই সম্পন্ন হল, ক্ষতি কি? আজকের দিনে আপনাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে সখীর কত তৃপ্তি হবে-সেটাও ভেবে দেখুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরী আসনে বসিল, কস্তুরী কৃষ্ণার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল— তুমি খাওয়াও—আমি চললাম।

কৃষ্ণা বলিল— তা কি হয়? তুমি বসে না খাওয়ালে উনি খেতে পারবেন কেন? গলা খাটো করিয়া বলিল— তাছাড়া মহামান্য অতিথির অমর্যাদা হবে যে!

দুই সখীতে মেঝের উপর বসিল। গৌরী নীরবে আহার সম্পন্ন করিয়া জলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া দেখিল তাহাতে লাল রঙের পানীয় রহিয়াছে। এই কয়দিন ঝিন্দে থাকিয়া সে জানিতে পারিয়াছিল যে এখানে সংযত-মাত্রায় সুরাপান করা দোষের নয়, এমনকি ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহা অসঙ্কোচে করিয়া থাকে। সুতরাং এ পাত্রের লাল-পানি যে কোন্ দ্রব্য তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না; সে পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল— আমাকে একটু সাদা জল দিন—মদ আমি খাই না।

কৃষ্ণা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল; গৌরী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চট্ করিয়া সামলাইয়া বলিল— অথাৎ ছেড়ে দিয়েছি, আর খাই না। ঝিন্দের শঙ্কর সিং যে ঐ রক্তবর্ণ তরল পদার্থটি কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া থাকেন একথা ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদে অবশ্য অবিদিত থাকিবার কথা নয়।

কস্তুরীর মুখ সহসা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে চোখ দুটি একবার গৌরীর মুখের পানে তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহার মনের প্রীতি-প্রফুল্ল কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। গৌরীর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কৃষ্ণা দ্রুত-পদে জল আনিতে উঠিয়া গেল, গৌরী ও কস্তুরী মুখোমুখি বসিয়া রহিল। দুইজনেই সঙ্কুচিত; গোপনে কস্তুরীর দেহ আলোড়িত করিয়া লজ্জার একটা ঝড় বহিয়া গেল। ওড়নাখানা সে গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া বসিল।

দুইজনে মুখোমুখি কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? এদিকে কৃষ্ণাও বোধ করি দুষ্টামি করিয়া ফিরিতে দেরি করিতেছে। গৌরী কণ্ঠের জড়তা দূর করিয়া আস্তে আস্তে বলিল— মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর ও জিনিস ছোঁব না।

কথাটা বলিয়াই সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন সে অকারণে এই মিথ্যা কথাটা বলিতে গেল? মদ সে ধরিলই বা কবে, ছাড়িলই বা কবে? শঙ্কর সিং-এর ভূমিকা অভিনয় করিবার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রয়োজন মিথ্যাচারে কি আবশ্যক? সে নিজের উপর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু যে বস্তুটির লোভে সে নিজের অজ্ঞাতসারে ওকথা বলিয়াছিল তাহা পাইতে বিলম্ব হইল! আবার তেমনি একটি চকিত সলজ্জ চাহনি সুস্মিত সপ্রশংস প্রসন্নতার রসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল।

কি আশ্চর্য চক্ষু! কি অপূর্ব সম্মোহন দৃষ্টি! গৌরী মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল— এমন সুন্দর লজ্জা সে আর কোথায় দেখিয়াছে? ইহারা পুরুষের সম্মুখে অসঙ্কোচে বাহির হয়, ঘোমটার বালাই নাই, অথচ ভাব-ভঙ্গিতে কোথাও এতটুকু সম্ভ্রমশালীনতার অভাব নাই। বাঙালীর মেয়েরা কি ইহাদের চেয়ে অধিক লজ্জাশীলা?

জলের গেলাস লইয়া কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল, বলিল–ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, ওরা আসছে সদলবলে এই ঘরে চড়াও করতে।

জল পান করিয়া গৌরী আসনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা পানের বাটা কস্তুরীর হাতে দিয়া বলিল— নাও, বরকে পান দাও।

একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া কস্তুরী পানের বাটা দুই হাতে ধরিয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরী সোনালী তবকমোড়া পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিল।

এমন সময় আর কোনো বাধা না মানিয়া সখীর দল একঝাঁক প্রজাপতির মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কিঙ্কিনী পাঁয়জোরের শব্দে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে আসিয়া গৌরীকে ঘিরিয়া ধরিল; লছমি কপট অভিমানের সুরে বলিল–সখীকে পেয়ে আমাদের ভুলে গেলেন?

সখি-বহের বাহিরে কস্তুরী কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল–তোরা এখন যা হয় কর, আমি পালাই। বলিয়া অলক্ষ্যে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ লছমির সহিত রঙ্গ-তামাসার পর গৌরী কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিল–একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সিংগড়ে খবর পাঠানো হয়নি। তারা হয়তো ভাবছে আমি—

কৃষ্ণা বলিল— খবর অনেক আগে পাঠানো হয়েছে। আপনার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা, প্রজাদের পক্ষে মোটেই শুভ নয়।

গৌরী বলিল—প্রজাপতিদের মধ্যে পড়ে প্রজাদের কথা ভুলে যাওয়া আর বিচিত্র কি?

কৃষ্ণা বলিল–আমরা কি প্রজাপতি

গৌরী হাসিয়া বলিল—সবাই নয়। তুমি ভিমরুল।

ভ্রূভঙ্গি করিয়া কৃষ্ণা বলিল–কেন—আমি ভিমরুল কেন?

গৌরী বলিল—মধুর দিকেও তোমার লোভ আছে, আবার হুল ফোটাতেও ছাড় না।

বাঁকা হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল—কখন হুল ফোটালাম?

গৌরী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কস্তুরী নাই। ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষু কৃষ্ণার দিকে ফিরাইয়া বলিল— তোমার শাস্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব, কিন্তু তা আর হতে দিলে না।

কৃষ্ণা বলিল-সে কি? আপনার জন্য এত করলাম, তবু শাস্তি বেড়ে গেল?

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল— হ্যাঁ!

কি করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাব বলুন তো?

গৌরী উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া পরিচারিকা আসিয়া কৃষ্ণার কানে কানে কি বলিল। কৃষ্ণা পরিহাস ত্যাগ করিয়া বলিল–সর্দার ধনঞ্জয় এসেছেন, বাহির-মহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এত শীঘ্র! গৌরীর মুখখানা একটু ম্লান হইয়া গেল; সে আর একজনের চরিত্র অভিনয় করিতেছে তাহা স্মরণ হইল। তবু হাস্যমুখে সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল–আজ তাহলে চললাম। স্বর্গে আসবার ইচ্ছা হলে আবার কিস্তার জলে ডুব দেওয়া যাবে–কি বল রম্ভাবাঈ?

বোধ হয় আগে হইতে মন্ত্রণা ছিল, সকলে একসঙ্গে হাত পাতিয়া বলিল— আমাদের বকশিশ?

কি বকশিশ চাও?

আপনি যা দেবেন।

আচ্ছা বেশ। আমার সঙ্গে তো এখন কিছু নেই, এমন কি কাপড়টা পর্যন্ত ধার করা। আমি তোমদের বকশিশ পাঠিয়ে দেব। ভাল কথা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

লছমি বলিল—না, আমরা সবাই কুমারী। শুধু কৃষ্ণার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

গৌরী বলিল— আচ্ছা বেশ, তাহলে কৃষ্ণা ছাড়া আর সকলকে একটি করে বকশিশ পাঠিয়ে দেব।

কৌতূহলী লছমি জিজ্ঞাসা করিল–কি বকশিশ দেবেন?

একটি করে বর। বলিয়া হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিল।

অন্দর ও সদরের সন্ধিস্থলে কৃষ্ণা বিদায় লইল, বলিল–আমার শাস্তি কিসে লাঘব হবে, তা তো বললেন না?

আজ নয়—যদি সুবিধা হয় আর একদিন বলব। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া প্রতিহারীর অনুসরণ করিয়া গৌরী সদর মহলে প্রবেশ করিল।

মজলিশ-ঘরে ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেও এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপকে সসম্মানে মধ্যে বসাইয়া আদর আপ্যায়ন করিতেছিলেন— স্বভাবতঃই নদীবক্ষে দুর্ঘটনার কথা হইতেছিল, ধনঞ্জয় একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক আখ্যায়িকা রচনা

করিয়া বুঝাইতেছিলেন যে, ব্যাপারটা নিতান্তই দৈব-দুর্ঘটনা—এমন সময় গৌরী আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইলেন। ধনঞ্জয় দ্রুতপদে কাছে আসিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন মহারাজ, অক্ষত আছেন? কোনো প্রকার অসুস্থতা বোধ করছেন না?

গৌরী হাসিয়া বলিল— কিছু না, বরঞ্চ ভালই বোধ করছি। কিন্তু তোমার চেহারাখানা তো ভাল ঠেকছে না সর্দার?—চোট পেয়েছ?

ধনঞ্জয় হাসিলেন; হাসিটা কিন্তু আমোদের নয়। বলিলেন— বিশেষ কিছু নয়, শরীরে চোট সামান্যই লেগেছে। কিন্তু সে যাক। অনঙ্গদেওয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন–এখন অনুমতি করুন, রাজাকে নিয়ে আমরা সিংগড়ে ফিরি। সেখানে সকলেই অত্যন্ত উল্কণ্ঠিত হয়ে আছেন।

মন্ত্রী অনঙ্গদেও ঝড়োয়ার পক্ষ হইতে রাজার বিপন্মুক্তিতে আনন্দ ও অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন–কিন্তু আজ রাত্রিটা মহারাজ এই পুরে বিশ্রাম করলে হত না? মহারাজের শুভাগমন এতই আকস্মিক যে, আমরা তাঁর যোগ্য সংবর্ধনা করবার অবকাশ পেলাম না

ধনঞ্জয় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন–তা সম্ভব নয়। আজ রাত্রে মহারাজকে রাজধানীতে ফিরতেই হবে। পরে মহারাজকে সংবর্ধনা করবার আপনারা অনেক সুযোগ পাবেন, আজ অনুমতি দিন।

অনঙ্গদেও সহাস্যে বলিলেন–উনি এখন আমাদেরও মহারাজ, ওঁর ইচ্ছাই আমাদের কাছে। আদেশ। তাঁহার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে গৌরী ঘাড় নাড়িল— ভাল, পঞ্চাশজন সওয়ার সঙ্গে দিই?

একটু চিন্তা করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন–তা দিন। মহারাজ জীবিত আছেন সংবাদ পেয়েই আমি রুদ্ররূপকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছি। পার্শ্বচর আনবার কথা মনেই হয়নি।

অল্পকাল মধ্যেই সম্মুখে ও পশ্চাতে পঞ্চাশজন বল্লমধারী ঘোড়সওয়ার লইয়া তিনজন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে কোনো কথা হইল না। গৌরী ঘোড়ার উপর বসিয়া হেঁটমুখে নিজের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল। কিস্তার সেতু পার হইয়া সিংগড়ে পদার্পণ করিবার পর, ধনঞ্জয় একবার মাত্র কথা কহিলেন, তীক্ষ্ণ চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

গৌরী নিদ্রোত্থিতের মত মুখ তুলিয়া বলিল–হয়েছিল।

ধনঞ্জয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ ভীষণ অন্ধকার ও ভ্রূকুটি কুটিল হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

সিংগড়ের প্রাসাদের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গোপন মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল। গৌরী, ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি গালিচার উপর আসীন ছিলেন, রুদ্ররূপ দ্বারে দাঁড়াইয়া পাহার দিতেছিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে; নগরের আমোদ-প্রমোদ রাজার মৃত্যুসংবাদে থামিয়া গিয়াছিল, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছে। দুর হইতে তাহার কলরব কানে আসিতেছে।

বজ্রপাণি ললাটের একটা কাল-শিরার উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন— বিপদ এই যে, এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে রাজ্যসুদ্ধ এমন একটা সোরগোল পড়ে যাবে যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ময়ুর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যদি ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দেয় তাহলে আমাদের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। শঙ্কর সিং-এর বদলে অন্য একজনকে রাজা খাড়া করেছি, এমন কী অভিষেক পর্যন্ত করিয়েছি, এই অভিযোগ যদি সে প্রকাশ্য দরবারে আনে— তার সদুত্তর আমাদের পক্ষ থেকে কি আছে?

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন–এ অভিযোগ লোকে বিশ্বাস করবে?

বজ্রপাণি বলিলেন— বিশ্বাস না করুক, একটা সন্দেহ তত জন্মাতে পারে। ময়ূরবাহন যে-প্রকৃতির লোক, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সে উদিতকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে, বলতে পারে আসল রাজাকে উদিত শক্তিগড়ে বন্দী করে রেখেছে।

ধনঞ্জয় বলিলেন— ওকথা যদি বলে তাহলে সে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়বে, শঙ্করকে গুম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বজ্রপাণি বলিলেন— কিন্তু তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে কি? বরং শঙ্কর সিং যদিবা এখনো বেঁচে থাকেন, তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠবে।

গৌরী অজ্ঞাতসারে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ বজ্রপাণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ যে ময়ুরবাহনের কাজ তাতে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?

গৌরী বলিল–বিন্দুমাত্র না। সে হাসি ময়ুরবাহনের, একথা আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি।

আপনি তাকে চোখে দেখেননি?

না।

এক হাসি ছাড়া আপনার আর কোনো প্রমাণই নেই?

না— কিন্তু–

বজ্রপাণি হাত তুলিয়া বলিলেন—জানি। এ যে ময়ূরবাহনের কাজ তাতে আমারও কোনো সংশয় নেই। সে ছাড়া এমন কাজ করবার দুঃসাহস উদিত সিং-এরও নেই। কিন্তু কথা তো তা নয়। ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিতে গেলে তার অপরাধ সকলের সামনে সাবুদ করতে হবে। ময়ূরবাহন কি নিজের দোষ স্বীকার করবে ভেবেছেন? বরঞ্চ পঁচিশটা সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দেবে যে, ও-সময় সে আর এক জায়গায় ছিল। তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রমাণ কি? শুধু ঐ হাসি ছাড়া আর কিছু আছে কি?

ধনঞ্জয় অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন–কিন্তু এত প্রমাণ খুঁজে বেড়াবারই বা দরকার কি? রাজার হুকুমে যদি আমরা তাকে ধরে এনে কয়েদ করে রাখি কিম্বা যদি কোতল করি, তাহলেই বা কে কি বলতে পারে? প্রজার দণ্ডমুণ্ডের উপর রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে অন্তত আমাদের দেশে আছে। রাজা আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়।

বজ্রপাণি ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন–তুমি বুঝছ না ধনঞ্জয়, রাজার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে সে আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন একজন সামান্য মজুর বা দোকানদার নয়, সে দেশের একজন। গণ্যমান্য লোক, তার একজন মস্ত মুরুব্বি আছে। রাজা সিংহাসনে বসেই যদি তাকে ধরে এনে বিনা বিচারে কোতল করেন, তাহলে রাজ্যে কি ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হবে–সেটা ভেবে দেখ। উদিত এই নিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলবে, ইংরেজ

গভর্নমেন্টকে এর মধ্যে টেনে আনবে। তার ওপর জাল রাজার কথাটা যদি কোনোক্রমে বেরিয়ে পড়ে তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে একবার বুঝে দেখ।

কিছুক্ষণ সকলে নতমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রীর অকাট্য যুক্তিজাল ভেদ করিয়া ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিবার কোনো পন্থাই খুঁজিয়া পাইলেন না।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন–আপনি কি করতে বলেন?

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া শেষে বজ্রপাণি বলিলেন— আজ রাগের মাথায় মরিয়া হয়ে ওরা এই দুঃসাহসিকতার কাজ করে ফেলেছে, তাদের নৌকাখানা ডুবে না যেতেও পারত— মাঝি-মাল্লারা ধরা পড়তে পারত, এমন কি স্বয়ং ময়ূরবাহন হাতে হাতে গ্রেপ্তার হতে পারত। সুতরাং এরকম কাজ আর তারা সহজে করবে বলে মনে হয় না। এক ভয় গুপ্তহত্যা— এঁকে গুপ্তভাবে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সেজন্য আমি ভয় করি না। সতর্ক থাকলে ওদিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই।

গৌরী নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল— রাজা হবার সুখ তো অনেক দেখতে পাচ্ছি।

বজ্রপাণি বলিলেন— আমার মতে এখন কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকাই একমাত্র যুক্তি। শঙ্কর সিং যে শক্তিগড়ে আছেন এটা আমাদের অনুমান মাত্র— সে-সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হয়ে তারপর তাঁকে উদ্ধার করবার মতলব ঠিক করা যাক। ইতিমধ্যে

ময়ূরবাহনকে যদি কোনো রকমে ফাঁদে ফেলতে পারি কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কপালের স্ফীত স্থানটায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— কিন্তু ইতিমধ্যে শঙ্কর সিংকে উদিত যদি খুন করে?

মাথা নাড়িয়া ধনঞ্জয় বলিলেন— তা করবে না। আপনি যে জাল রাজা তার একমাত্র প্রমাণ তাহলে লুপ্ত হয়ে যাবে। উদিত নিজের ভাইকে খুন করে আপনাকে গদিতে বসাবে— এতবড় পাগল সে নয়।

এই সময় বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্ররূপ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; দ্বারের বাহিরে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথোপকথন হইল, তারপর রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া বলিল— মাঝিমাল্লার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌকার জন্য ডুবুরি নামানো হয়েছিল কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না; খুব সম্ভব কিস্তার স্রোতের টানে তলায় তলায় ভেসে গেছে।

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া সংবাদ শুনিলেন। কিয়ঙ্কাল পরে ধনঞ্জয় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন–হুঁ। ময়ূরবাহনের কপাল ভাল।

প্রাসাদের দেউড়িতে মধ্যরাত্রির ঘন্টা বাজিল। কিন্তু কাহারো কানে তাহা পৌঁছিল না, সকলে নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

বাহিরে আবার পদশব্দ হইল। এবার পদশব্দ অপেক্ষাকৃত লঘু, অন্দর মহলের দিক হইতে আসিল। রুদ্ররূপ আবার বাহিরে গেল, অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরীর কানে কানে কি বলিল।

গৌরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল–কি! চম্পা আমার জন্যে জেগে বসে আছে! সত্যিই তো, আমি

ঘুমুলে যে সে বেচারীর ঘুমোবার হুকুম নেই! কচি মেয়েটার ওপর কি অত্যাচার দেখ দেখি! না, কালই আমি ওকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব। এখন তোমরা মন্ত্রণা শেষ কর সদর, আমি চললাম! বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধনঞ্জয়ও উঠিয়া অর্ধপথে একটা হাই নিরুদ্ধ করিয়া বলিলেন–চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আজ রাতটাও আমাকে বসেই কাটাতে হবে।

গৌরী বাধা দিয়া বলিল— না না—সর্দার, তুমি ভারি ক্লান্ত হয়েছ, যাও, নিজের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে নাও গে। তোমার বদলে রুদ্ররূপ আমার কাছে থাকবেখন।

ধনঞ্জয় বলিলেন— তা হয় না—আমাকেই থাকতে হবে।

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— আমি হুকুম দিচ্ছি সর্দার, তুমি এই মুহূর্তে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর গে, বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। যাও রাজার আদেশ দ্বিরুক্তি করো না।

গৌরী পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথাটা বলিল বটে, কিন্তু এই পরিহাসের অন্তরালে যে সত্যকার একটা জোর আছে তাহা ধনঞ্জয়ও অনুভব করিলেন। এই বাঙালী যুবকটিকে তাঁহারা রাজা সাজাইয়াছেন। বটে, কিন্তু ইহার যে একটা অত্যন্ত জোরালো স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সকল সময় ইহাকে লইয়া পুতুল-খেলা চলিবে না—তাহার প্রথম ইঙ্গিত পাইয়া ধনঞ্জয় ও ভার্গব দুইজনেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসুভাবে ভার্গবের দিকে ফিরিতেই তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন–উনি ঠিক বলেছেন। তুমি যাও, তোমার বিশ্রাম করা নিতান্ত দরকার। রুদ্ররূপ আজ ওঁর প্রহরীর কাজ করুক।

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া ফৌজী স্যালুট করিয়া বলিলেন-যো হুকুম! তাহার চোখের দৃষ্টিতে যদি বা একটু শ্লেষের আভাস প্রকাশ পাইল, কণ্ঠস্বরে তাহার লেশমাত্র ধরা পড়িল না।

গৌরী একটু হাসিল, তারপর রুদ্ররূপের স্কন্ধে হাত রাখিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

·

সিংগড়ের রাজপ্রাসাদে যখন এইরূপ মন্ত্রণা শেষ হইতেছিল, বেতপুরের রাজ-অন্তঃপুরেও একটি শয়নকক্ষে তখন সখীতে-সখীতে গোপন মন্ত্রণা চলিতেছিল। মন্ত্রণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। শয়নকক্ষের নিভৃত নির্জনতায় দুইটি অন্তরঙ্গ সখীতে যে-সকল মনের কথা হয়, তাহা সাধারণের শ্রোতব্য নয়। শুধু সত্যের অনুরোধেই তাহা প্রকাশ করিতে হইতেছে।

কস্তুরীর শয়নকক্ষ হইতে অনেক রাত্রে নিদ্রালু সখীরা একে একে প্রস্থান করিলে পর কৃষ্ণা বলিল—এবার ঘুমোও। আলো নিবিয়ে দিই?

শয়নঘরে দুইটি পালঙ্ক; একটিতে কস্তুরী শয়ন করে, অন্যটিতে প্রিয়সখী কৃষ্ণা। কস্তুরী শুইয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণা তখনো চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে ঘরে অলসভাবে ঘুরিতেছিল।

কস্তুরী বলিল— আর একটু থাক! তোর বুঝি ঘুম পাচ্ছে?

কৃষ্ণা একটা হাই গোপন করিয়া বলিল— হ্যাঁ। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— তোমার বুঝি আজ আর চোখে ঘুম নেই?

কস্তুরী কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া একটু সলজ্জ হাসিল।

কৃষ্ণা নিজের পালঙ্কে গিয়া বসিল, বলিল— কি ভাবা হচ্ছে জানতে পারি কি?

কিছু না। তুই খানিক আমার কাছে এসে শো।

কৃষ্ণা চোখে দুষ্টামি ভরিয়া বলিল-এরি মধ্যে একলা শুতে ভাল লাগছে না?

দূর হ পোড়ারমুখি!

দূর তো হবই। তখন কি আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে?

তুই না হয় তখন বিজয়লালের ঘরে যাস।

তাই যাব। তুমি চলে গেলে আর কি আমি এ মহলে থাকব ভেবেছ? হঠাৎ কৃষ্ণার দুইচক্ষু অপুর্ণ হইয়া উঠিল।

কস্তুরী দুই হাত বাড়াইয়া বলিল— আয় কৃষ্ণা। —আচ্ছা, আলোটা নিবিয়েই দে।

আলো নিবাইয়া কৃষ্ণা কস্তুরীর পাশে আসিয়া শয়ন করিল। দুই সখী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর কৃষ্ণা বলিল— আচ্ছা, বিয়ের পরও তো তুমি এ বাড়িতে থাকতে

পার। তখন তো দুই রাজ্যই এক হয়ে যাবে। তিনি কি তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন না?

কস্তুরী জবাব দিল না; কৃষ্ণা আবার নিজমনেই বলিল-না, তা কি করে দেবেন? তাঁকে তো সিংগড়েই থাকতে হবে, আর তোমাকে ছেড়েও তিনি থাকতে পারবেন না। এ বাড়ি তখন শূন্য পড়ে থাকবে।

কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কস্তুরী বলিল—তখন তুই এ মহলে থাকিস। আমি রোজ কিস্তা পার হয়ে তোকে দেখে যাব।

কৃষ্ণা বলিল— তা কি করে হবে? তোমার মালিক যেমন তোমাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবেন, আমার মালিকও তো আমাকে নিজের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে পুরবে।

কস্তুরী বলিল—সেই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে যাবার জন্যে তোর প্রাণ কি করছে তা যদি না জানতাম, তাহলে কি তোকে আমি ছেড়ে দিতাম কৃষ্ণা? আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

দুই সখীতে অনেকক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিল। শেষে একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কৃষ্ণা বলিল— ও-কথা থাক—ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আজ কেমন দেখলে বল।

কাকে?

আহা, বুঝতে পারোনি যেন।

কস্তুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— আগে তুই বল, তোর কেমন লাগল।

আমার আর কেমন লাগালাগি কি? ভাল লাগলেও তুমি তো আর প্রাণ ধরে কাউকে ভাগ দিতে পারবে না।

ভাগ চাস?

চাইলেও অন্যায় হয় না।

কেন?

আমার প্রিয়সখীকে তিনি যে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তার বদলে আমায় কি দিয়েছেন? খালি শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

কস্তুরী ধরা-ধরা গলায় বলিল— তোর সখীকে তোর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কৃষ্ণা। এ জন্মে নয়।

এ জন্মে নয়? ঠিক?

ঠিক।

আচ্ছা, আমিও তবে আর কিছু চাই না। আমার সখী আর আমার–কানে কানে–বিজয়লালের কুঁড়ে ঘর যতদিন আমার আছে ততদিন আমি তাদের বদলে স্বর্গও চাইনে।

এবার তবে বল, তোর কেমন লাগল।

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ উত্তর দিল না; তারপর আস্তে আস্তে যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল—দেখ, ওঁর নামে অনেক কথাই আমাদের কানে এসেছে। কথাগুলো এতদিন অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ হয়নি— রাজপুত্রেরা বেশীর ভাগই তো ঐ রকম হয়ে থাকেন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে মনে। হল, তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তার অধিকাংশই মিথ্যে কথা।

কস্তুরী বলিয়া উঠিল সব মিথ্যে কথা কৃষ্ণা–একটা কথাও সত্যি নয়!

কৃষ্ণা বলিল–হ্যাঁ।–দেখ, এক বিষয়ে আমরা গেরস্তর মেয়েরা রানীদের চেয়ে সুখী–আমরা স্বামীকে পুরোপুরি পাই। তাই, তোমার কথা ভেবে মনকে চোখ ঠারছিলাম বটে, কিন্তু প্রাণে আমার সুখ ছিল না। আজ একটিবার মাত্র এঁকে দেখে আমার প্রাণে শান্তি ফিরে এসেছে; বুঝেছি, আমার এই অনাঘ্রাত ফুলটি সত্যিই মহেশ্বরের পায়ে পড়বে।

কস্তুরী নীরবে উদ্বেলিত হৃদয়ে এই অমৃততুল্য কথা শুনিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কৃষ্ণাকে এত মিষ্টি কথা বলিতে সে আর কখনো শুনে নাই। মাটির ঠাকুরকে অভ্যাসমত পূজা করিতে বসিয়া যাহারা অপ্রত্যাশিতভাবে জীবন্ত হৃদয়দেবতাকে সম্মুখে পায় তাহাদের মনের ভাব বুঝি এমনিই হয়।

কৃষ্ণা বলিতে লাগিল—পুরুষ মানুষ মন্দ কি ভাল, তার চোখের চাউনি দেখে ধরা যায়। আজ উনি তোমার দিকে চাইলেন, মনে হল যেন চোখ দিয়ে তোমার আরতি করলেন। যার মনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে লোভ আছে সে অমন করে চাইতে পারে না। সত্যি বলছি, ওঁর সম্বন্ধে কোনো কুৎসাই আর আমার বিশ্বাস হয় না।

অর্ধ রুদ্ধকণ্ঠে কস্তুরী বলিল— আমারও না। যতদিন দেখিনি ততদিন মনে হত হয়তো সত্যি। কিন্তু এখন

এখন আমার সখীর জীবন-যৌবন সফল হল। কবি গেয়েছেন জান তো?—তব যৌবন যব সুপুরুষ সঙ্গ!

অতঃপর দুইজনে বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল– কি ভাবছ?

কস্তুরী থামিয়া থামিয়া বলিল— ভাবছি—একটা কথা।

কি কথা?

বলব না।

লক্ষ্মীটি বল। আমার কাছে মনের কথা লুকোলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

কৃষ্ণার বুকে মুখ গুঁজিয়া মৃদু অস্ফুটস্বরে কস্তুরী বলিল— ভাবছি, আবার কবে দেখতে পাব। কৃষ্ণা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—এখনো যে তিন ঘণ্টা হয়নি–এরি মধ্যে আর না দেখে থাকতে পারছ না?

কস্তুরী বলিল— তুই যে বিজয়লালকে রোজ দেখিস, একদিন যদি ঘোড়ায় চড়ে তোর জানলার সামনে এসে না দাঁড়ায় তাহলে সারাদিন ছটফট করে বেড়াস! সে বুঝি কিছু নয়?

আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার এরি মধ্যে এই! এখনি দেখেছ—আবার এখনি দেখবার জন্য পাগল! তুমি যে শকুন্তলাকেও হার মানালে!

কতটুকুই বা দেখেছি?

কেন, আর একটু বেশী করে দেখে নিলেই পারতে? তখন তো কেবলই পালাই পালাই করছিলে?

ভারি যে লজ্জা করছিল।

তা আমি কি করব— এখন লজ্জার ফল ভোগ কর।

কৃষ্ণা–সত্যি বল, আবার কবে দেখা হবে?

বিয়ের রাত্রে।

কস্তুরী চুপ করিয়া রহিল; কৃষ্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল— অতখানি বুঝি সবুর সইবে? তার আগেই দেখতে হবে?—বেশ, মন্ত্রীমশায়কে বলি তিনি রাজাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান।

দূর। সে কি ভাল হবে?

কেন মন্দই বা কি হবে? তিনি আজ যেভাবে এসেছিলেন তাতে আমরা তাঁকে সমুচিত সংবর্ধনা করতে পারিনি। তাই তাঁকে যদি এবার নিমন্ত্রণ করে আনা হয় তাতে দোষ কি হবে?

কস্তুরী নীরব রহিল দেখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল, ইহাও তাহার মনঃপুত নয়, বলিল—এতেও মন উঠছে? তবে কি চাই, খুলে বল না।

কস্তুরী বলিল— আর আমি বলতে পারি না। বুঝেছিস তো।

কি?

তুই একবার দেখা।

কৃষ্ণা হাসিল— অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে—কেউ জানবে না—এই তো?

কস্তুরী মৌন। কৃষ্ণা তখন বলিল—আচ্ছা, তা আর শক্ত কি? শুধু একবারটি দেখা নিয়ে তো কথা? উনি কিস্তায় জলবিহার করতে বেরুবেন তার বন্দোবস্ত করছি তুমি ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো। তাহলে হবে তো?

কৃষ্ণা, তুই বড় জ্বালাস!

হুঁ, তার মানে শুধু দেখলে মন ভরবে না, দেখা দেওয়াও চাই। কেমন?

কস্তুরী কৃষ্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল, কৃষ্ণা বলিল— বুঝেছি। কিন্তু কাজটি তো সহজ নয়। একটু ভাবতে হবে।

তা ভাব না—কে বারণ করেছে?

কিন্তু আজ নয়, ওদিকে সকাল হতে চলল— হুঁশ আছে? এবার ঘুমিয়ে পড়।

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল, নিজের শয্যায় গিয়া শুইবার উপক্রম করিয়া বলিল— কিন্তু আমার একার বুদ্ধিতে বোধ হয় কুলোবে না—আর একজনের সাহায্য চাই।

কার?

আমার একজন মন্ত্রী আছে–তার।

কস্তুরী হাসিয়া বলিল–তা বেশ ভো, কাল বাড়ি যা না। অনেক দিন তো যাসনি।

কৃষ্ণা বলিল— উঃ কি দরদ। অনুমতি দিতে একটুও দেরি হল না। বলিয়া কৃষ্ণা শুইয়া পড়িল।

একটা কৌতূহল কস্তুরীর মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে জিজ্ঞাসা করিল— আচ্ছা কৃষ্ণা, তুই বিজয়লালকে খুব ভালবাসিস?

কেন বল দেখি?

সব সময় তার কথা ভাবিস?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, দেখা হলে কি করিস?

হাসি, কথা কই, গল্প করি।

আর—

আর কিচ্ছু না— ঐ পর্যন্ত। একটু থামিয়া বলিল—একদিন শুধু পান দিতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকে গিয়েছিল।

সেটি বুঝি মনে গেঁথে রেখেছিস?

কৃষ্ণা চোখ বুজিয়া আবার সেই স্পর্শটা নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইল, বলিল— ইচ্ছে করে মনে গেঁথে রেখেছি তা নয়–ভুলতে পারা যায় না।

কস্তুরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল— আচ্ছা, এবার ঘুমো।

দুজনেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘুম সহসা আসিল না। দীর্ঘকাল এইভাবে কাটিবার পর কৃষ্ণা একবার জিজ্ঞাসা করিল,–ঘুমোলে?

না। কেন?

একটা কথা ভাবছি।

কি কথা?

তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ আমি ঘটাতে পারি, কিন্তু লোকে জানতে পারলে তোমার নিন্দে হবে।

এইবার কস্তুরীর কণ্ঠে রানীর সতেজ অভিমান প্রকাশ পাইল, সে বলিল–আমার মালিকের সঙ্গে যদি আমি দেখা করি কার কি বলবার আছে? আর, আমার কাজের সমালোচনাই বা করে কে?

এই অসহিষ্ণুতায় কৃষ্ণা অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল— তা ঠিক কাল তাহলে আমি বাপের বাড়ি যাব?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আজ তবে আর কথা নয়।

দুই সখী পাশ ফিরিয়া শুইল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিষ্কম্ভক

পরদিন প্রভাতে ঈষৎ জ্বরভাব লইয়া গৌরী শয্যাত্যাগ করিল। তাহার শরীরে রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রভূত শক্তি সঞ্চিত ছিল, তাই ক্লান্ত দেহের উপর জলমজ্জনেও তাহাকে বিশেষ কাবু করিতে পারে নাই-নচেৎ নিউমোনিয়া কি ঐ জাতীয় কোনো রোগ পাকাইয়া ভোলা অসম্ভব ছিল না।

উপরন্তু কাল রাত্রে ঘুমও ভাল হয় নাই। রুদ্ররূপকে শয়নঘরের দ্বারের কাছে পাহারায় রাখিয়া সে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিল বটে কিন্তু নানা চিন্তায় রাত্রি তিনটা পর্যন্ত নিদ্রা তাহার চোখে দেখা দেখা দেয়। নই। যতই তাহার মন কস্তুরীবাঈকে কেন্দ্র করিয়া মাধুর্যের রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল, মাধুর্যের আবেশে একথাও সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই যে,-সে অনধিকারী, এই সাহচর্যের অমৃত মনে মনে আস্বাদন করিবারও তাহার সত্যকার দাবি নাই। কে সে? আজ যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করা যায়, কাল গৌরীশঙ্কর রায় নামধারী যুবককে ছদ্মবেশে মুখ লুকাইয়া এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আর তাহাই তো ঘটিবে—আজ হোক, কাল হোক, শঙ্কর সিং ফিরিয়া আসিয়া নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার করিবে, কস্তুরীবাঈয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তখন এই অখ্যাতনামা বাঙালী যুবককে কে স্মরণ রাখিবে? দু একটা ধন্যবাদের বাঁধাবুলি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিবে। কস্তুরী কিছু জানিতেও পারিবে না।

কিন্তু শঙ্কর সিং যদি ফিরিয়া না আসে? যদি উদিত তাহাকে সত্যই খুন করিয়া থাকে?— গৌরী জোর করিয়া এ চিন্তা মন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল। সে সম্ভাবনার কথা ভাবিতেও তাহার বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কস্তুরীকেও সে মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। না— পরের বাগদত্তা স্ত্রীর কথা সে ভাবিবে না, এবং ভবিষ্যতে যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম—যাহাতে দেখা না হয় সেদিকে সতর্ক থাকিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া সে দেখিল চম্পা দ্বারের কাছে হাজির আছে। আশ্চর্য হইয়া বলিল— চম্পা, তুমি কি রাত্রে ঘুমোও না?

চম্পা সরল চোখদুটি তুলিয়া বলিল— ঘুমিয়েছিলাম তো!

গৌরী বলিল— কিন্তু এত সকালে উঠলে কি করে?

চম্পা গভীরভাবে বলিল—আমি না উঠলে যে মহলের আর কেউ ওঠে না, সবাই কাজে গাল করে। তাই সবার আগে আমায় উঠতে হয়।

গৌরী হাসিল। বৃহৎ রাজ-সংসারের সহস্র কমভারে অবনত এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার স্নেহ জয় করিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে হইল চম্পা যেন এই ঝি রাজবংশের রাজলক্ষ্মী। এত সহজ সরল অথচ এমন গৃহিণীর মত কর্মপটু মেয়ে সে আর কখনো দেখে নাই! চম্পাকে প্রাসাদের দাসী চাকরানী অত্যন্ত সম্ভ্রম ও ভয় করিয়া চলে তাহা সে দেখিয়াছিল। মাঝে যেকয়মাস চম্পা ছিল না, সে কয়মাস রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে একপ্রকার অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল; চম্পার পুনরাবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৌরীর অসুস্থতার কথা শুনিয়া চম্পা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই। এখনো তো সর্দারজি আসেননি, রুদ্ররূপকেই পাঠাই।

রুদ্ররূপ কোথায়?

চম্পা হাসিয়া বলিল— আপনার দোরের বাইরে নাক ডাকিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আহা, বেচারা বোধহয় শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে এখন ডেকো না। আমার ডাক্তারের দরকার নেই, তুমি শুধু একবাটি গরম দুধ আমাকে পাঠিয়ে দাও।

তা আনছি! কিন্তু ডাক্তারেরও আসা দরকার। বলিয়া চম্পা প্রস্থান করিল।

অল্পকাল পরেই রুদ্ররূপ ঘরে ঢুকিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ে তখনো গত রাত্রির যোচুবেশ, কোমরে লম্বিত তলোয়ার, মাথার পাগড়ি অটুট—কিন্তু চোখে ঘুম জড়াইয়া রহিয়াছে। গৌরী হাসিয়া বলিল–চম্পা ঘুমতে দিলে না?

রুদ্ররূপ লজ্জিতভাবে বলিল—সকালবেলা একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

তা হোক—বোসো— গৌরী নিজে একটা কৌচে বসিয়াছিল, পাশের স্থানটা দেখাইয়া দিল।

রুদ্ররূপ বলিল— কিন্তু চম্পাদেঈ যে ডাক্তার ডাকতে বললেন!

তা বলুক— তুমি বোসো।

রাজার পাশে একাসনে বসিতে রুদ্ররূপ রাজী হইল না। সে ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু নিম্ন আসন কিছু চোখে পড়িল না। তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া গৌরী বলিল—–আমার পাশে এসে বোসো, এখন তো বাইরের কেউ নেই।

রুদ্ররূপ তখন সঙ্কুচিত হইয়া কৌচের একপাশে বসিল। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বাহিরে চম্পার পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্ররূপ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া ফৌজী প্রথায় শক্ত হইয়া গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকাইয়া যষ্টিবৎ দাঁড়াইল। রাজার পাশে একাসনে বসিবার বেয়াদবি যদি চম্পার চোখে পড়ে তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

রেকাবের উপর দুধের বাটি লইয়া চম্পা প্রবেশ করিল। রুদ্ররূপকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল— তুমি এখনো যাওনি যে?

রুদ্ররূপ চমকাইয়া উঠিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল–কুমার বললেন যে ডাক্তারের দরকার নেই।

চম্পা মুখ রাঙা করিয়া বলিল— রাজার মত নিতে আমি তোমায় বলেছিলাম?

রুদ্ররূপ অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। চম্পা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল— যাও এখনি।

করুণ নেত্রে রুদ্ররূপ গৌরীর দিকে চাহিল। গৌরী হাসিতে লাগিল, বলিল— যাও, রুদ্ররূপ। এ মহলে চম্পার হুকুমই সকলকে মেনে চলতে হয়– এমন কি আমাকেও।

যো হুকুম বলিয়া রুদ্ররূপ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দুধের বাটিতে এক চুমুক দিয়া গৌরী সকৌতুকে বলিল–এখানে সবাই তোমাকে ভয়ঙ্কর ভয় করে—না চম্পা?

চম্পা সহজভাবে সায় দিয়া বলিল— হ্যাঁ।

বিশেষত রুদ্ররূপ।

ও ভারি বোকা—তাই ওকে কেবলি বকতে হয়।

গৌরী হাসিয়া উঠিল। দুধের বাটি শূন্য করিয়া চম্পার হাতে ফেরত দিয়া বলিল–যাও, গিন্নি ঠাকরুন, এখন সংসারের কাজকর্ম কর গে।

রুদ্ররূপ অবিলম্বে ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার গঙ্গানাথ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— বিশেষ কিছু নয়, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। আজ আর কোনো পরিশ্রম করবেন না—ঘরেই থাকুন। ব্রাণ্ডি ও কুইনিনের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে রুদ্ররূপকে জোর করিয়া ছুটি দিয়া গৌরী একাকী হেলান দিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়িবার পর আজ অসুস্থদেহে তাহার বাড়ির কথা মনে পড়িল। এ কয়দিন অভিষেকের আয়োজন ও হুড়াহুড়িতে কাহারো নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না-দাদাকে। পৌঁছানোর সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। দাদা বৌদিদি নিশ্চয় উদ্বেগে কালযাপন করিতেছেন। আর বিলম্ব করিলে হয়তো দাদা নিজেই টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ জানিতে চাহিবেন। অভিষেক হইয়া গিয়াছে–এ খবর অবশ্য তিনি সংবাদপত্রে জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু গৌরীই যে রাজা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? হয়তো নানা দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া। উঠিয়াছেন। গৌরীও ভাবিতে ভাবিতে নিজের অবহেলার জন্য অনুতপ্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ঠিক নয়টার সময় ধনঞ্জয় দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গৌরী বলিয়া উঠিল— সর্দার, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, দাদাকে খবর দিতে হবে।

ধনঞ্জয় বলিলেন-বেশ তো, একখানা চিঠি লিখে দিন না।

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, চিঠি পৌঁছুতে তিন-চার দিন দেরি হবে। তার চেয়ে তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও।

ধনঞ্জয় চিন্তা করিয়া বলিলেন— সে কথাও মন্দ নয়। কিন্তু আপনার নামে টেলিগ্রাম পাঠালে চলবে না। চারিদিকে শত্রু—এমনভাবে তার লিখতে হবে যাতে আপনার দাদা ছাড়া আর প্রকৃত মর্ম কেউ না বুঝতে পারে।

গৌরী বলিল— বেশ, তোমার নামেই তার পাঠানো হোক। খবরটা দাদার কাছে পৌঁছুলেই হল। এস, একটা খসড়া তৈরি করি।

দুইজনে মিলিয়া টেলিগ্রামের খসড়া তৈয়ারি করিলেন, তাহাতে লিখিত হইল—

এখানকার সংবাদ ভাল। শুভকার্য হইয়া গিয়াছে কোনো বিঘ্ন হয় নাই। ভ্রাতার জন্য চিন্তা নাই। আপনাকে মাঝে মাঝে সংবাদ দিব। আপনি আপাতত চিঠিপত্র লিখিবেন না।ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় টেলিগ্রামের মুসাবিদা লইয়া প্রস্থান করিলে গৌরী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নে গৌরী কিস্তার ধারের মুক্ত বারান্দায় গিয়া বসিয়াছিল। কাছে কেবল রুদ্ররূপ ছিল। আজ গৌরী বেশ ভালই ছিল, এমন কি এইখানে বসিয়া কিছু রাজকার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বজ্রপাণি কয়েকখানা জরুরী সনন্দ ও পরোয়ানা তাহার দ্বারা মোহর করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও এসকল দলিলে মোহরের সঙ্গে রাজার সহি-দস্তখৎ দেওয়া বিধি, তবু আপাতত শুধু মোহরেই কাজ চালাইতে হইয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর দস্তখৎ গৌরী এখনো ভাল আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

ধনঞ্জয়ও এতক্ষণ গৌরীর কাছেই ছিলেন, এইমাত্র একটা কাজে বাহিরে ডাক পড়িয়াছে তাই উঠিয়া গিয়াছেন।

দুজনে নীরবেই বসিয়াছিল। রুদ্ররূপ একটু অন্যমনস্কভাবে বিস্তার নৌকা চলাচল দেখিতেছিল ও কোমরবন্ধে আবদ্ধ তলোয়ারখানা আঙুল দিয়া নাড়িতেছিল। তাহার পাতলা সুশ্রী ধারালো মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করিল- রুদ্ররূপ, ঝিন্দে সবচেয়ে ভাল তলোয়ার খেলোয়াড় কে বলতে পার?

রুদ্ররূপ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল; একটু চিন্তা করিয়া বলিল— ঝিন্দের সবচেয়ে বড় তলোয়ারবাজ বোধহয় সর্দার ধনঞ্জয়না ময়ূরবাহন।

বল কি? গৌরী বিস্মিতভাবে চাহিল।

রুদ্ররূপ ঘাড় নাড়িল—হ্যাঁ–সদারজিও খুব ভাল খেলোয়াড়—বিশ বছর আগে হলে বোধহয় ময়ূরবাহনকে হারাতে পারতেন কিন্তু এখন

আর তুমি?

আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন কিম্বা সর্দার আমাকে বাঁ হাতে সাবাড় করে দিতে পারেন।

গৌরী ঈষৎ বিস্মিত চোখে এই সরল নিরভিমান যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল— তারপর বলিল— আচ্ছা, তুমি ময়ূরবাহনের সঙ্গে লড়তে পার?

রুদ্ররূপ একটু হাসিয়া বলিল–হুকুম পেলেই পারি। লড়াই করব বলেই তো আপনার কুট খাচ্ছি।

মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও?

হ্যাঁ। মৃত্যুকে আমার ভয় হয় না রাজা।

রুদ্ররূপের কাঁধে হাত রাখিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল–কিসে তোমার ভয় হয় ঠিক করে বলতে রুদ্ররূপ?

রুদ্ররূপ চিন্তা করিয়া বলিল— কি জানি। আপনাকে সম্মান করি আপনি রাজা, সর্দারকেও সম্মান করি; কিন্তু ভয় কাউকে করি বলে তো মনে হয় না।

গৌরী পুনরায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল–কিন্তু আমি জানি তুমি একজনকে ভয় কর।

রুদ্ররূপ চকিত হইয়া চাহিল—কাকে?

চম্পাকে।

রুদ্ররূপের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল, সে নতনেত্রে চুপ করিয়া রহিল।

গৌরী তরলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল তুমি চম্পাকে ভালবাস-না?

রুদ্ররূপ তেমনি হেঁটমুখে বসিয়া রহিল-উত্তর করিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল ওকে বিয়ে কর না কেন?

রুদ্ররূপ মুখ তুলিল, চোখ দুটি অত্যন্ত করুণ; আস্তে আস্তে বলিল-আমি বড় গরীব, চম্প বাবা আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন না।

গৌরী চমকিয়া উঠিল, রাজার পার্শ্বচর যে গরীব হইতে পারে একথা সে ভাবিতেই পারে নাই বলিল— গরীব?

হ্যাঁ। আমরা পুরুষানুক্রমে সিপাহী, আমাদের টাকা কড়ি নেই।

তাতে কি হয়েছে?

ত্রিবিক্রম সিং একজন প্রকাণ্ড বড়মানুষ—রাজ্যের প্রধান শেঠ। তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন?

তুমি কখনো প্রস্তাব করে দেখেছ?

না।

একটু চিন্তা করিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল—চম্পা তোমার মনের কথা জানে?

না। সে এখনো ছেলেমানুষ; তাকে রুদ্ররূপ চকিতভাবে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল— সর্দার আসছেন। তাঁকে-তাঁর সামনে-

না না, তোমার কোনো ভয় নেই।

সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন। গৌরী ফিরিয়া দেখিল তাঁহার মুখ গম্ভীর, হাতে একখানা চিঠি। জিজ্ঞাসা করিল—কি সর্দার?

সর্দার নিঃশব্দে চিঠি তাহার হাতে দিলেন। ঝড়োয়ার রাজ-দরবার হইতে দেওয়ান অনঙ্গদেও কর্তৃক লিখিত পত্র—সাড়ম্বরে বহু সমাসযুক্ত ভাষায় অশেষপ্রতাপ দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর। সিংহকে সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে স্বস্তিবাচনপূর্বক জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, এখন মহারাজ বস্তুত ঝড়োয়া রাজ্যেরও ন্যায্য অধিপতি; সুতরাং তিনি কৃপাপূর্বক কিছুকাল তাঁহার ঝড়োয়া রাজ্যে আসিয়া রাজগৌরবে বাস করতঃ প্রজা ও ভৃত্যবৃন্দের সেবাগ্রহণ করিলে ঝড়োয়ার আপামর সাধারণ কৃতকৃতার্থ হইবে। ঝড়োয়ার মহিমময়ী রাজ্ঞী, পারিষদবৃন্দ ও প্রজা সামান্যের পক্ষ হইতে দেবপাদ মহারাজের শ্রীচরণে এই নিবেদন উপস্থাপিত হইতেছে। অলমিতি।

চিঠি পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখে রক্তিমাভা আনা-গোনা করিতে লাগিল। পাঠ শেষ হইয়া যাইবার পরও সে কিছুক্ষণ চিঠিখানা চোখের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। তারপর সর্দারের দিকে চোখ। তুলিয়া দেখিল, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সে তাচ্ছিল্যভরে পত্র ফেরত দিয়া বলিল— এ চিঠি এল কখন?

এই মাত্র।

বজ্রপাণি এ চিঠির মর্ম জানেন?

জানেন—তিনিই পত্র খুলেছেন।

তুমিও জানো বোধ করি?

জানি।

ঈষৎ হাসিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল–তা তোমরা দুজনে কি স্থির করলে?

ধনঞ্জয় দুই চক্ষু গৌরীর মুখের উপর নিশ্চল রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— আমরা কিছুই স্থির করিনি। আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি কিস্তার পরপারে শুভ্র রাজসৌধের। উপর গিয়া পড়িল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল— ঝড়োয়ায় যাবার কোনো দরকার দেখি না। ওদের লিখে দাও যে অশেষপ্রতাপ দেবপাদ এখন নিজের রাজ্য নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত আছেন, তাছাড়া তাঁর শরীরও ভাল নয়। এখন তিনি ঝড়োয়ায় গিয়ে থাকতে পারবেন না। একটু হাসিয়া বলিলচিঠিখানা বেশ মোলায়েম করে ভাল ভাল কথা দিয়ে সাজিয়ে লিখো। কিন্তু সে কাজ বোধ হয় বজ্রপাণি খুব ভাল রকমই পারবেন।

ধনঞ্জয়ের মুখ হইতে সংশয়ের মেঘ কাটিয়া গেল, তিনি প্রফুল্লস্বরে যো হুকুম বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

গৌরী তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিল—তাড়াতাড়ি কিছু নেই কাল-পরশু চিঠি পাঠালেই চলবে।—এখন তুমি বোসো, কথা আছে?

ধনঞ্জয় হাঁটু মুড়িয়া গালিচার একপাশে বসিলেন। গৌরী বলিল— শঙ্কর সিং সম্বন্ধে কি হচ্ছে? তোমরা যে রকম ঢিলাভাবে কাজ করছ তাতে আমার মনঃপূত হচ্ছে না।

ধনঞ্জয় বলিলেন–ঢিলাভাবে কাজ হচ্ছে না—তবে খুব গোপনে কাজ করতে হচ্ছে। সোরগোল করে করবার মত কাজ তো নয়।

কি কাজ হচ্ছে?

শক্তিগড়ে কোনো বন্দী আছে কিনা তারি সন্ধান নেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের অনুমান বৈ তো নয়, ভুলও হতে পারে।

সন্ধান করে কিছু জানা গেল?

না। এত শীঘ্র জানা সম্ভবও নয়; মাত্র কাল থেকে লোক লাগানো হয়েছে।

গৌরী চিন্তা করিয়া বলিল— হুঁ। অন্যদিকে কোনো অনুসন্ধান হচ্ছে?

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন— না, অন্যদিকে যারা শঙ্কর সিং-এর অনুসন্ধান করছিল তাদের ডেকে নেওয়া হয়েছে। শঙ্কর সিং যখন সিংহাসনে আসীন রয়েছেন তখন তাঁর তল্লাস করতে গেলেই লোকে নানারকম সন্দেহ করবে।

তা ঠিক, গুপ্তচরেরা নিজেরাই সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে।

এখন যা-কিছু অনুসন্ধান আমাদের নিজেদের করতে হবে। বাইরের লোককে কোনো কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু আমার আর চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছে না সর্দার। এখন তো অভিষেক হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ে লাগা দরকার। তোমাদের রাজা-গিরি আর আমার ভাল লাগছে না।

ঈষৎ বিস্ময়ে ধনঞ্জয় তাহার দিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন— কিন্তু উপস্থিত কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। অন্তত যতদিন না শক্তিগড়ের পাকা খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ এই বিষয়ে কথাবার্তার পর ধনঞ্জয় উঠিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কিস্তার কালো বুকে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পশ্চিমাকাশের

অস্তরাগের পশ্চাৎপটে কিস্তার সেতুটি কঙ্কাল-সেতুর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী একটা নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল— রুদ্ররূপ, দারিদ্র কি ভালবাসার পথে খুব বড় বিঘ্ন বলে তোমার মনে হয়?

রুদ্ররূপ হেঁটমুখে কি চিন্তা করিতেছিল, চকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গি করিয়া বলিল— তার চেয়ে ঢের বড় বাধা আছে–যা অলঙ্ঘনীয়। তুমি হতাশ হয়ো না।

আশার উল্লাসে রুদ্ররূপের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আরো কিছু শুনিবার আশায় সাগ্রহে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঝড়োয়ার প্রাসাদে তখন একটি একটি করিয়া দীপ জ্বালিয়া উঠিতেছিল। গৌরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে চল, ভেতরে যাওয়া যাক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিমরুলের অনুতাপ

রানীর সহিত গৌরীর দৈবক্রমে সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইবার পর হইতে গৌরী ও ধনঞ্জয়ের মাঝখানে ভিতরে ভিতরে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বের বাধাহীন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল অথচ ঠিক মনোমালিন্যও বলা চলে না। কিন্তু গৌরী যখন ঝড়োয়ায় গিয়া থাকিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তখন আবার অজ্ঞাতসারেই এই দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া পূর্বের সৌহার্দ্য ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। গৌরী মাঝের এই দুই দিন অন্তরের মধ্যে যেন একটু অবলম্বনহীন ও অসহায় বোধ করিতেছিল, এখন আবার সে মনে বল পাইল। একযোগে কাজ করিতে গিয়া সহকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব যে মানুষকে কিরূপ বিকল করিয়া ফেলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহার কুফল চিন্তা করিয়া দুইজনেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ঝিন্দে আসিয়া গৌরী আর একটি অনুগত ও অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিল— সে রুদ্ররূপ। বয়স দুইজনেরই প্রায় সমান, অবস্থাগতিকে সাহচর্যও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছিল—তাই পদ ও মর্যাদার আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও দুইজনে পরস্পরের খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। গৌরী যে সত্যই রাজা নয় ইহা রুদ্ররূপ জানিত—সেজন্য তাহার ব্যবহার ও বাহ্য আদব কায়দায় তিলমাত্র ত্রুটি হয় নাই কিন্তু তবু মানুষ-গৌরীর প্রতিই সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর প্রতি তার মনোভাব

কিরূপ ছিল তাহা বলা কঠিন; সম্ভবত শঙ্কর সিংকে মানুষ হিসাবে সে কোনদিন দেখে নাই রাজা বা রাজপুত্র ভাবিয়া তাহার প্রতি কর্তব্য করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু গৌরীর প্রতি তাহার আনুরক্তি এই রাজভক্তিরও অতিরিক্ত একটা ব্যক্তিগত প্রীতির রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর জন্যও রুদ্ররূপ নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিতে পারিত, কিন্তু গৌরীর জন্য প্রাণ দিতে পারিত আনন্দের সঙ্গে—কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধে নয়।

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিবার পর গৌরী প্রাসাদের বাহির হইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। অবশ্য প্রাসাদে নিষ্কর্মার মত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত না, সর্বদাই কোনো-না-কোনো কাজ। লাগিয়া থাকিত। প্রত্যহ সকালে দরবারে গিয়া বসিতে হইত, সেখানে নানাবিধ কাজ, মন্ত্রণা ও দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করাও দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি সর্বপ্রকারে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার মনে হইত যেন তাহার গতিবিধির চারিপাশে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তাহাকে ঘিরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধনঞ্জয়ের কাছে নগর ভ্রমণের কথা উত্থাপন করিলে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিতেন— এখন নয়, আরো দুদিন যাক। বস্তুত নগরভ্রমণে বাহির হওয়া যে সর্বাংশে নিরাপদ নয় তাহা গৌরীও বুঝিত। দেশে অভিষেকের উৎসব এখনও শেষ হয় নাই, এই সময় গোলমালের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে শঙ্কর সিং-এর কোনো সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। শক্তিগড়ের দিকে যাহারা তল্লাস করিতে গিয়াছিল তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছে যে, শক্তিগড়ের অর্ধক্রোশের মধ্যে কাহারো যাইবার উপায় নাই—দুর্গ ঘিরিয়া থানা বসিয়া গিয়াছে। সেই

গণ্ডীর ভিতর কেহ পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিলেই অশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে। দুর্গের আশেপাশে যে-সকল গ্রাম আছে সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া কোনো ফল পাওয়া যায় নাই; গ্রামবাসীরা উদিতের প্রজা ও ভক্ত, কিছু জানিলেও বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ করে না, উপরন্তু কৌতূহলী জিজ্ঞাসুকে গালাগালি ও মারধর করিয়া দূর করিয়া দেয়। একজন দুঃসাহসিক গুপ্তচর নৌকায় করিয়া কিস্তার দিক হইতে দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল—উদিত তাহাকে ধরিয়া আনিয়া স্বহস্তে এমন নির্দয় প্রহার করিয়াছে যে লোকটা আধমরা হইয়া কোনোমতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতঃপর আর কেহ ও অঞ্চলে যাইতে রাজী নয়।

এইরূপে শঙ্কর সিং-এর অনুসন্ধান কার্য চারিদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার নিশ্চল হইয়া আছে।

অভিষেকের দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্নে গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রাসাদ সংলগ্ন ব্যায়ামগৃহে অসি-ক্রীড়া করিতেছিল। ধনঞ্জয় অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন ও বিচারকের কার্য করিতেছিলেন।

দেশী তলোয়ার খেলা। দীর্ঘ ও ঈষদ্ব তরবারির ফলায় সূক্ষ্ম কাপড় জড়ানো, খেলোয়াড় দুজনের মুখ ও গ্রীবাদেশ লোহার মুখোসে ঢাকা। খেলার ঝোঁকে দুইজনেই বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—মুখোসের জালের ভিতর দিয়া তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। দুইটি তলোয়ারই বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। কদাচিৎ অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিয়া ঝনকার

উঠিতেছে, কখনো একের তরবারি অন্যের দেহ লঘুভাবে স্পর্শ করিতেছে। ধনঞ্জয় মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন— সাবাস। চোট! জখম! ইত্যাদি।

ক্রমে রুদ্ররূপের অসিচালনায় ঈষৎ ক্লান্তি ও শিথিলতার লক্ষণ দেখা দিল; সে গৌরীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল। তারপর হঠাৎ গৌরী তাহার ঘূর্ণিত অসিকে পাশ কাটাইয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল, শিরস্ত্রাণের উপর ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। ধনঞ্জয় বলিয়া উঠিলেন–ফতে!

দুইজন যোদ্ধাই তরবারি নামাইয়া দাঁড়াইল। গৌরী মুখোস খুলিয়া ঘর্মাক্ত মুখ মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিল—সর্দার, এবার তুমি এস।

ধনঞ্জয় নিঃশব্দে তরবারি রুদ্ররূপের হাত হইতে লইয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তরবারির মুঠ একবার কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন–আসুন!

মুখোস পরবে না?

দরকার নেই।

অসি চালনায় ধনঞ্জয়ের খ্যাতি গৌরী জানিত, সে সাবধানে নিজের দেহ যথাসাধ্য সুরক্ষিত করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল। ধনঞ্জয় শুধু অসিখানা নিজ দেহের সম্মুখে ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ডাহিনের দিকে একটা ফাঁকা লক্ষ্য করিয়া গৌরী

সেইদিকে তলোয়ার চালাইল, ধনঞ্জয় অবহেলাভরে তাহা সরাইয়া দিলেন। আবার গৌরী বাঁ দিকে আক্রমণ করিল, কিন্তু কব্জির একটা অলস সঞ্চালন দ্বারা ধনঞ্জয় সে আঘাত নিজ তরবারির উপর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাত দিয়া একটা বিরক্তির মাছি তাড়াইতেছেন।

ধনঞ্জয় যতই স্থির ও অবিচলিত হইয়া রহিলেন গৌরী ততই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে আর সে ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া এক পা পিছু হটিয়া চিতাবাঘের মত ধনঞ্জয়ের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাঁহার মাথার উপর তলোয়ারের কোপ বসাইতে গিয়া দেখিল ধনঞ্জয়। সেখানে নাই। ধনঞ্জয় কোথায় তাহা নির্ণয় করিবার পূর্বেই সে নিজের দক্ষিণ হস্তের মুঠিতে একটা বেদনা অনুভব করিল ও পরক্ষণেই দেখিল তলোয়ারখানা তাহার অবশ হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতেছে।

ধনঞ্জয় ভূমি হইতে তলোয়ার তুলিয়া গৌরীকে প্রত্যর্পণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—ফতে।

মুখোস খুলিয়া গৌরী কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল–কি হল বল দেখি?

কিছু না, আপনি হেরে গেলেন।

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ অথচ সকৌতুক ভঙ্গি করিয়া বলিল— তা তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু হারালে কি করে?

একটা খুব ছোট্ট প্যাঁচ আছে—আপনি সেটা জানেন না।

আমার গোয়ালিয়রের ওস্তাদ তাহলে ফাঁকি দিয়েছে বল।–একটা চেয়ারের পিঠে কাশ্মীরী শালের ঢিলা চোগা রাখা ছিল, গৌরী সেটা গায়ে দিতে লাগিল, ধনঞ্জয় তরবারি রাখিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন।

এই সময় ব্যায়ামগৃহের খোলা দ্বারের কাছে একজন শাস্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ররূপ। বলিল—কি চাও?

শাস্ত্রী কহিলঝড়োয়া থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এসেছে মহারাজের দর্শন চায়।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন— কি জন্যে দর্শন চায় কিছু বলেছে?

শাস্ত্রী বলিল— না, সে কিছু বলতে চায় না।

ধনঞ্জয় বলিলেন—রুদ্ররূপ, দেখ কি ব্যাপার।

কিয়ৎকাল পরে রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে দর্শনপ্রার্থীর নাম সুবাদার বিজয়লাল রাজার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে, ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতেছে না।

ধনঞ্জয় গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনি একে চেনেন নাকি?

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল–না।

ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—আচ্ছা, তাকে এইখানেই নিয়ে এস।

ঝড়োয়ার দরবার হইতে প্রেরিত দূতও হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে; এই ভাবিয়া ধনঞ্জয় ঘরের কোণের এক মেহগনির আলমারি খুলিয়া একটি রিভলবার তুলিয়া লইয়া তাহাতে টোটা ভরিতে লাগিলেন। আলমারিতে ছোরাছুরি, পিস্তল ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র সাজানো ছিল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কি হচ্ছে সর্দার?

বলা তো যায় না—হয়তো বলিয়া সর্দার একটা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সৈনিক বেশধারী দীর্ঘকায় যুবক রুদ্ররূপের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট রাজাকে দেখিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি? কি চাও?

যুবক একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল অদূরে জানালার পাশে ধনঞ্জয় একটা রিভলবার লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছেন, পিছনে দ্বারের কাছে রুদ্ররূপ নিশ্চল হইয়া

দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল-মহারাজের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে।

গৌরী ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে বলিল—তা আগেই শুনেছি। তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে তোমার কী গোপনীয় কথা থাকতে পারে?

যুবক একটু ইতস্তত করিল, একবার ধনঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে কহিল— আমি ভিমরুলের দূত।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৌরী তাহার দিকে চাহিল—ভিমরুলের দূত? ও! কৃষ্ণা–?

যুবক গম্ভীরভাবে মস্তক অবনত করিল।

গৌরী তখন প্রফুল্লমুখে বলিল-কৃষ্ণা ভিমরুলের দূত!—একথা আগে বলনি কেন? তা — ভিমরুলের কি সমাচার?

যুবক মুখ ফিরাইয়া নীরবে ধনঞ্জয়ের দিকে চাহিল।

গৌরী সহাস্যে বলিল–সর্দার, তুমি যেতে পার। সুবাদারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।–না, কোনো ভয় নেই–সুবাদার পরিচিত লোকের দূত।

অনিচ্ছাভরে রিভলবার রাখিয়া ধনঞ্জয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

গৌরী রুদ্ররূপকে বলিল— তুমি ঘরের বাইরে পাহারায় থাকো—কেউ না আসে।

রুদ্ররূপ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে গৌরী উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল— কৃষ্ণার কি খবর?

যুবক উত্তর না দিয়া পাগড়ির ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। গৌরী পড়িল, তাহাতে লেখা আছে—

স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজের চরণে কৃষ্ণাবাঈয়ের শত শত প্রণাম। এই পত্রের বাহক সুবাদার বিজয়লাল ঝড়োয়া রাজবংশের এবং সেই সঙ্গে আমার একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী। তাহাকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন।

আপনি সেদিন আমার উপর রাগ করিয়া আমাকে শাস্তি দিবেন বলিয়াছিলেন। শাস্তির ভয়ে আমি অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছি— স্থির করিয়াছি আজ রাত্রেই প্রায়শ্চিত্ত করিব। আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

আজ রাত্রি দশটার সময় কিস্তার পুল যেখানে ঝড়োয়ার রাজ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে। বিজয়লাল উপস্থিত থাকিবে। আপনি আসিবেন। ছদ্মবেশে আসিতে হইবে, যাহাতে কেহ আপনাকে চিনিতে না পারে। একজন বিশ্বাসী পার্শ্বচর সঙ্গে লইতে পারেন। বিজয়লাল আপনাকে যথাস্থানে লইয়া আসিবে। ইতি—আপনার চরণাশ্রিতা কৃষ্ণা।

চিঠি মুড়িতে মুড়িতে গৌরী মুখ তুলিল, কৌতুক-তরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল–কৃষ্ণা তোমার কে?–বিজয়লাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল-ও বুঝেছি, তুমি কৃষ্ণার ভাবী সৌহর!—কিন্তু কৃষ্ণা হঠাৎ এত অনুতপ্ত হয়ে উঠলে কেন তা তো বুঝতে পারছি না। পত্রখানা চোগার পকেটে রাখিয়া বলিল–হ্যাঁ—আমি যাব। যথাসময়ে তুমি হাজির থেকো।

যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া বিজয়লাল অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। গৌরী আবার বলিয়া উঠিল— কিন্তু আসল কথাটা কি বল তো? এ নিমন্ত্রণের ভিতর একটা গুঢ় রহস্য আছে বুঝতে পারছি। সেটা কি?

বিজয়লাল বলিল— তা জানি না মহারাজ।

বিজয়লাল গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত অল্পভাষী। তাহার শ্যামবর্ণ দৃঢ় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা যায় না। তবু গৌরী যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত–বিজয়লালের ফৌজী গোঁফের আড়ালে অল্প একটু হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

বিজয়লাল প্রস্থান করিলে গৌরী চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। মনের অগোচরে পাপ নাই বটে কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি মিলিয়া মানুষের মনে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন সে মনকে চোখ ঠারিতেছে কিনা নিজেই। বুঝিতে পারে না। তাই কৌতূহল ও আগ্রহ যতই গৌরীর মনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ততই সে মনকে বুঝাইতে লাগিল যে, ইহা কেবল একটা মজাদার অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আগ্রহ, বহুদিন রাজপ্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার পর মুক্তির আশাই তাহাকে উদগ্রীব করিয়া তুলিয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর কোনো আকর্ষণই থাকিতে পারে না।

অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে কৃষ্ণার এই অনুতাপের মর্ম যে সে অভ্রান্তভাবে বুঝিয়াছে, একথা যদি তাহার জাগ্রত মনের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিত তাহা হইলে বোধ হয় সে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। অথচ পরিহাস এই যে, ধনঞ্জয় সকল কথা শুনিয়া নিশ্চয় এ প্রস্তাবে বাধা দিবেন, ইহা অনুমান করিয়া সে আগে হইতেই মনে মনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

তাই ধনঞ্জয় যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি? দূত কিসের? তখন গৌরী চিঠিখানা সন্তর্পণে পকেটে রাখিয়া দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—কিছু না। আজ রাত্রে একবার নগর ভ্রমণে বার হব। সঙ্গে কেবল রুদ্ররূপ থাকবে।

বিস্মিত ধনঞ্জয় বলিল-সেকি! হঠাৎ এরকম—

গৌরী বলিল— হঠাৎই স্থির করেছি।

ধনঞ্জয় বলিলেন–কিন্তু রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় যাওয়া তো হতে পারে না।

গৌরী একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিল— নিশ্চয় হতে পারে, যখন আমি স্থির করেছি।

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ আকুঞ্চিত চক্ষে গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— কিন্তু এরকম স্থির করার কারণ জানতে পারি কি?

না। গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু থামিয়া বলিল— ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা ছদ্মবেশে থাকবো, কেউ চিনতে পারবে না।

কিন্তু ঝড়োয়ায় যাওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?

গৌরীর মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সংযত স্বরেই বলিল— উচিত কিনা সেকথা আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আমি ঝিন্দের বন্দী নই—আপাতত ঝিন্দের রাজা। ধনঞ্জয় আবার কি একটা বলিতে গেলেন, কিন্তু তৎপুর্বেই গৌরী ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শুন্য ঘরে ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে গৌরীর অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দত্তকুলের প্রহ্লাদ

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় সাধারণ ঝিন্দী সৈনিকের বেশ পরিধান করিয়া গৌরী ও রুদ্ররূপ বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে কক্ষটায় সাজসজ্জা হইতেছিল সেটা রাজার সিঙার-ঘর–অথাৎ ড্রেসিং রুম। চম্পাদেঈ ও ধনঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন।

মাথার উপর প্রকাণ্ড জরীদার রেশমী পাগড়ি বাঁধিয়া গৌরী আয়নার সম্মুখীন হইয়া দেখিল, এ বেশে সহসা কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না। চম্পা ও ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল–কেমন দেখাচ্ছে?

ধনঞ্জয় গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিলেন; চম্পা সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল— ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যদি ভিখিরির সাজপোশাক পরেন, তবু আপনাকে রাজার মতই দেখায়।

গৌরী মুখের একটু ভঙ্গিমা করিয়া বলিল— তা বটে। বনেদী রাজা কিনা। এখন চললাম। তুমি কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘুমিয়ে পড় গিয়ে আমার জন্য জেগে থেকো না। যদি জেগে থাকো, কাল সকালেই তোমাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব।

এতবড় শাসনবাক্যে ভীত হইয়া চম্পা ক্ষীণস্বরে বলিল— আচ্ছা।

চম্পাকে জব্দ করিবার একটা অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বুঝিয়া গৌরী মনে মনে হৃষ্ট হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় বিরস গম্ভীরমুখে বলিলেন– আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে কিন্তু জেগে থাকতে হবে।

অপরাহ্নে ধনঞ্জয়ের প্রতি রূঢ়তায় গৌরী মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল, বলিল— তা বেশ তো সর্দার। কিন্তু বেশীক্ষণ জাগতে হবে না, আমরা শিগগির ফিরব।

প্রাসাদের পাশের একটি ছোট ফটক দিয়া দুইজনে পদব্রজে বাহির হইল। ফটকের শাস্ত্রী রুদ্ররূপের গলা শুনিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল, তাহার সঙ্গীটি কে তাহা ভাল করিয়া দেখিল না।

প্রাসাদের প্রাচীর-বেষ্টনী পার হইয়া উভয়ে সিংগড়ের কেন্দ্রস্থলে—যেখানে প্রকৃত নগর— সেইদিকে যাত্রা করিল।

নগরে তখনো রাজ-অভিষেকের উৎসব সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, এখনো গৃহে গৃহে দীপালি জ্বলিতেছে, দোকানে দোকানে পতাকা মালা ইত্যাদি দুলিতেছে, তবু আনন্দের প্রথম উদ্দীপনা যে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট্ট রাজ্য হইলেও রাজধানীটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। শহরের যেটি প্রধান বাজার, তাহাতে বহু লোকের

ব্যস্ত গমনাগমন ও যানবাহনের অবিশ্রাম। গতায়াত বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির ইঙ্গিত করিতেছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুই ধারে উচ্চ তিন-চারতলা ইমারৎ। কলিকাতার বড়বাজারের সঙ্কুচিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

উৎসুক চক্ষে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে গৌরী নিজের বর্তমান অবস্থার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যে গৌরীশঙ্কর রায়— এখানে আসিবার পর হইতে এই কথাটা একপ্রকার চাপা। পড়িয়া গিয়াছিল; অভিনয় করিতে করিতে অভিনেতাটির মনেও একটু আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন সে আবার নিজের চোখ দিয়া দেখিতে দেখিতে এই নূতনত্বের রস আস্বাদন করিতে করিতে চলিল। যেন বহুদিন পরে নিজের হারানো সত্তাকে ফিরিয়া পাইল।

শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় তাহাদের মত বেশধারী বহু ফৌজী সিপাহী ও নায়ক হাবিলদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র সেনানী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উপরন্তু এই রাজ্যাভিষেক পর্ব উপলক্ষে জঙ্গী য়ুনিফর্ম পরা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল–তাই গৌরী ও রুদ্ররূপ কাহারো বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

বাজারের চৌমাথায় এক পানওয়ালীর দোকানে খুশবুদার পান কিনিবার জন্য গৌরী দাঁড়াইল। দোকানের সম্মুখে বেশ ভিড় ছিল কারণ এ দোকানের পান শুধু বিখ্যাত নয়, পানওয়ালীও রূপসী এবং নবযৌবনা। রুদ্ররূপ পান কিনিবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া অলসভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ গৌরীর নজরে পড়িল, অনতিদূর রাস্তার অপর পারে একটা মণিহারীর দোকান। দোকানটি বেশ বড়, কাচ-ঢাকা জানালায় বিলাতী প্রথায় বহুবিধ মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক পণ্য সাজানো রহিয়াছে এবং প্রবেশদ্বারের মাথার উপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে সাইন-বোর্ড লেখা রহিয়াছে—

প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত
মণিহারীর দোকান

গৌরীর একটু ধোঁকা লাগিল। প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত! বাঙালী নাকি? প্রহ্লাদ নামটা বাঙালীর মধ্যে খুব চলিত নয় কিন্তু প্রহ্লাদচন্দ্র! ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি তো নামের মধ্যস্থলে চন্দ্র ব্যবহার করে না। শুধু প্রহ্লাদ দত্ত হইলে অন্য জাতি হওয়া সম্ভব ছিল। গৌরী উত্তেজিত হইয়া উঠিল-বাঙালীর সন্তান এই সুদূর বিদেশে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে!

রুদ্ররূপ সুগন্ধি মশলাদার পান আনিয়া হাতে দিতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— রুদ্ররূপ, ঐ দোকানের সাইন-বোর্ড দেখছ? কোন্ দেশের লোক আন্দাজ করতে পার?

রুদ্ররূপ বলিল— না। পাঞ্জাবি হতে পারে।

গৌরী বলিল— উহু, বোধ হয় বাঙালী। এস দেখা যাক।

রাস্তা পার হইয়া উভয়ে দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানের ভিতরটি বেশ সুপরিসর–গোটা চারেক ডে-লাইট ল্যাম্প মাথার উপর জ্বলিতেছে। দূরে ঘরের পিছন দিকে দোকানদারের গদি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গৌরী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল, গদির বিছানার উপর মুখোমুখি বসিয়া দুইজন লোক নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে–তুমি না গেলে চলবে না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে, সকালে স্টেশনে হাজির থাকা চাই। না, আজ আমি পারব না, আমার অনেক কাজ।—এক পক্ষের অনিচ্ছা ও অন্য পক্ষের সাগ্রহ উপরোধ, অস্পষ্টভাবে গৌরী শুনিতে পাইল।

রুদ্ররূপ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, মৃদুস্বরে বলিল –পেছন ফিরে দাঁড়ান, চিনতে পারবে।

দুইজনে পিছন ফিরিয়া জানালার পণ্য দেখিতে লাগিল। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—কে ওরা?

একজন ঝিন্দের স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস—অন্যটি বোধ হয় দোকানদার। চলুন, এখানে আর থেকে কাজ নেই।

একটু দাঁড়াও।

মিনিট পাঁচেক পরে স্টেশনমাস্টার অসন্তুষ্টভাবে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। তাহার কয়েকটা অসংলগ্ন কথা গৌরীর কানে পৌঁছিল— এই রাত্রে শক্তিগড় যাওয়া...কাল সকালেই আবার স্টেশন...

শক্তিগড় শুনিয়া গৌরী কান খাড়া করিয়াছিল, কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এতক্ষণে দোকানদারের হুঁশ হইল যে, দুইজন গ্রাহক দোকানে আসিয়াছে। সে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ক্যা চাহিয়ে বাবুসাব?

পশ্চিমী ধরনে কাপড় ও ছিটের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা দোকানদারকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া কাহার সাধ্য আন্দাজ করে যে সে পুরাপুরি খোট্টা নয়! গৌরী তাহার সম্মুখীন হইল; তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাংলা ভাষায় বলিল— তুমি বাঙালী?

লোকটি প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়াই সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল— হ্যাঁ, আমি বাঙালী। মহারাজ-আপনি—আপনি

চুপ। গৌরী ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল— তুমি কতদিন এখানে আছ?

হাতজোড় করিয়া প্রহ্লাদ বলিল—আজ্ঞে, প্রায় পনের বছর। এখানেই বসবাস করছি।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল— তুমি কায়স্থ? বাড়ি কোন্ জেলায়?

প্রহ্লাদ বলিল— আজ্ঞে কায়স্থ, বাড়ি বীরভূম জেলায়। কিন্তু পনের বছর দেশের মুখ দেখিনি। মাঝে মাঝে যেতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু কারবার ফেলে যেতে পারি না।

দেশে তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

আজ্ঞে না। দুর সম্পর্কের খুড়ো জ্যাঠা যারা ছিল তারা বোধ হয় এতদিনে মরে হেজে গেছে। আমি এই দেশেই বিবাহদি করেছি।

বাংলা দেশের কায়স্থ সন্তান ঝিন্দে আসিয়া কিভাবে বিবাহদি করিয়া ফেলিল, গৌরী ঠিক বুঝিল না; কিন্তু প্রহ্লাদ লোকটিকে তাহার মনে মনে বেশ পছন্দ হইল। সে যে অত্যন্ত চতুর লোক এই সামান্য কথাবাতাতেই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। গৌরী বলিল–বেশ বেশ, খুব খুশি হলাম। আমাকে যখন চিন্‌তে পেরেছ তখন বলি, আমি অপ্রকাশ্যভাবে নগর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি, একথা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা নয়। তুমি হুঁশিয়ার লোক, তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই।–এখন তোমার দোকানে উপহার দেবার মত ভাল জিনিস কি আছে দেখাও।

যে-আজ্ঞে মহাশয়! প্রহ্লাদ ভালমানুষের মত একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল–আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন যে আশ্চর্য হতে হয়। বাঙালী ছাড়া এরকম বাংলা বলতে আমি আর কাউকে শুনিনি।

তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গৌরী বলিল— তাই নাকি? তবে কি তোমার মনে হয় আমি বাঙালী?

না না—সে কি কথা মহারাজ! আমি বলছিলাম—

আমি অনেকদিন বাংলা দেশে ছিলাম, তাই ভাল বাংলা বলতে পারি—বুঝলে?

প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি সম্মতি-জ্ঞাপক ঘাড় নাড়িল; তারপর স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া দোকানের বহুবিধ সৌখীন ও মহার্ঘ্য পণ্যসম্ভার দেখাইতে লাগিল।

গজদন্ত ও সোনারূপার কারুশিল্পের জন্য ঝি প্রসিদ্ধ; অধিকন্তু অন্যান্য দেশ-বিদেশের বাহারে শিল্পও আছে। গৌরী পছন্দ করিয়া কয়েকটি জিনিস কিনিল। কিনিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া নয়, স্বদেশবাসী দোকানদারের প্রতি মমতাবশত প্রায় পাঁচ-সাত শত টাকার জিনিস খরিদ হইয়া গেল। গৌরী মনে মনে স্থির করিল খেলনাগুলি সে চম্পাকে উপহার দিবে।

একটি বৈদ্যুতিক টর্চ গৌরীর ভারি পছন্দ হইল। হাতির দাঁতের একটি ভুট্টা-প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা-তাহার ভিতরটা ফাঁপা, সে পুরিবার ব্যবস্থা আছে; সম্মুখে কাচ বসানো। ভুট্টার গায়ে একটি মাত্র লাল দানা আছে, সেটি টিপিলেই বিদ্যুৎ বাতি জ্বলিয়া উঠে।

টর্চটি হাতে লইয়া গৌরী বলিল— এটা আমি সঙ্গে নিলাম। বাকীগুলো প্রাসাদে পাঠিয়ে দিও-কাল দাম পাবে।

আহ্লাদিত প্রহ্লাদ করজোড়ে বলিল—যো হুকুম।

দোকান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে নীরবে দক্ষিণমুখে চলিল। এই পথই ঋজু রেখায় গিয়া কিস্তার পুলের উপর দিয়া ঝড়োয়ায় পৌঁছিয়াছে।

ক্রমে দোকানপাট শেষ হইয়া পথ জনবিরল হইতে আরম্ভ করিল। দুইপাশে আর ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ি নাই— মাঝে মঝে তরুবীথি; তরুবীথির পশ্চাতে কচিৎ দুই একখানা বড় বড় বাড়ি। অধিকাংশই ফাঁকা মাঠ।

ঝিন্দের পথে আলোকের ব্যবস্থা ভাল নয়, বিদ্যুৎ এখনো সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই। দূরে দূরে এক একটা কেরোসিন ল্যাম্পের স্তম্ভ; তাহা হইতে যে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে পথ চলার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। নবক্রীত টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া গৌরী চলিতে লাগিল।

মাইলখানেক পথ এইভাবে চলিবার পর একটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের লোহার রেলিং রাস্তার ধার দিয়া বহু দূর পর্যন্ত গিয়াছে দেখিয়া গৌরী টর্চের আলো ফেলিয়া ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছু দেখা গেল না, কেবল একটা অন্ধকার-দর্শন বাড়ির আকার অস্পষ্টভাবে চোখে পড়িল। রুদ্ররূপ বলিল—এটা উদিতের বাগানবাড়ি।

আরো কিছুদূর যাইবার পর বাগানবাড়ির উঁচু পাথরের সিংদরজা চোখে পড়িল। তাহারা সিংদরজার প্রায় সম্মুখীন হইয়াছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা ফিটন গাড়ি কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়াই গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে উত্তরদিকে মোড় লইল, গৌরী ও রুদ্ররূপ লাফাইয়া সরিয়া না গেলে গাড়িখানা তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িত। গৌরী গাড়ির পথ হইতে সরিয়া গিয়াই গাড়ির উপর টর্চের আলো ফেলিল। নিমেষের জন্য একটা পরিচিত মুখ সেই আলোতে দেখা গেল; তারপর জুড়ী-ঘোড়ার গাড়ি তীরবেগে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৌরী পিছন ফিরিয়া ক্রমশ ক্ষীয়মান চক্রধ্বনির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কহিল স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস। শক্তিগড়ে যাবার জন্যে ভারি তাড়া দেখছি। একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়িখানা উদিতের—না?

রুদ্ররূপ বলিল— হ্যাঁ। এইখানেই উদিত সিংয়ের আস্তাবল।

গৌরী কতকটা নিজমনেই বলিল— উদিতকে কি খবর দিতে গেল কে জানে। জরুরী খবর নিশ্চয়।

একটা এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। গৌরী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় উদিতের ফটকের ভিতর হইতে একখণ্ড কাগজ বাতাসে ওলট-পালট খাইতে খাইতে তাহার প্রায় পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। টর্চের আলো ফেলিয়া গৌরী দেখিল– একটা টেলিগ্রাম-কৌতূহলবশে তুলিয়া লইয়া পড়িল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে–

স্বরূপদাস–স্টেশনমাস্টার ঝিন্দ্
সন্ধান পাইয়াছি, গৌরীশঙ্কর রায় বাঙালী জমিদার চেহারা অবিকল–
কিষণলাল।

টেলিগ্রামখানা মুড়িয়া গৌরী পকেটে রাখিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— যাক, জানতে পেরেছে তাহলে। এইজন্যে এত তাড়া।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হইল না। রুদ্ররূপ দুই-একটা প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু গৌরী নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল, উত্তর দিল না। একসময় বলিল–প্রহ্লাদও তাহলে ওদের দলে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—ন তস্থৌ

পুল পার হইয়া ঝড়োয়ায় পদার্পণ করিবামাত্র পুলের একটা গম্বুজের পাশ হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল; চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—কে যায়?

পথে তখন অন্য জনমানব নাই।

সিপাহী-বেশী লোকটাকে ভাল ঠাহর করা গেল না; গৌরী প্রশ্ন করিল— তুমি কে! বিজয়লাল?

বিজয়লাল বলিল–হুজুর হাঁ। আপনার সঙ্গে কে?

রুদ্ররূপ।

ভাল। আমার সঙ্গে আসুন।

বিজয়লাল আগে আগে চলিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ তাহার অনুসরণ করিল। পুলের এলাকা পার হইয়া বড় সড়ক ছাড়িয়া বিজয়লাল বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তা ধরিল। রাস্তায় আলো নাই, পাশের বাড়িগুলিও অন্ধকার। সুতরাং কোথায় যাইতেছে গৌরী তাহা বুঝিতে

পারিল না; কিন্তু কিস্তার জল যে বেশী দূরে নয়, তাহা মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর বিজয়লাল একটি ছোট ফটকের সম্মুখে থামিল, ফটক খুলিয়া বলিল— আসুন!

ফটকের মাথায় স্তম্ভের উপর স্বল্পালোক বাতি জ্বলিতেছিল; গৌরী দেখিল, স্থানটা কোনো বড় বাড়ির খিড়কির বাগান। বাগান নেহাৎ ছোট নয়, বড় বড় ফলের গাছ দিয়া ঢাকা, স্থানে স্থানে বসিবার জন্য তরুমূলে গোলাকৃতি চাতাল তৈরি করা আছে।

গৌরীর মনে ঈষৎ বিস্ময়জড়িত প্রশ্ন জাগিল কার বাড়ি? এ তো ঝড়োয়ার রাজবাড়ি নয়।

প্রশ্নটা মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চমক ভাঙিল–মনের প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা এতক্ষণে তাহার সজাগ মনের কাছে মুখোমুখি ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার নিমন্ত্রণের গূঢ়ার্থও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এই জন্য কৃষ্ণা ডাকিয়াছে। কিন্তু সে তো বহুপূর্বে তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিল। তবু সে আসিল কেন? কি প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছিল?

এখনো ফিরিবার সময় আছে; কাহাকেও কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়া সটান ফিরিয়া যাইতে পারে। বিজয়লাল রুদ্ররূপ বিস্মিত হইবে, কিন্তু তাহাতে কি? সে তো নিজের কাছে খাঁটি থাকিবে! তবে কি ফিরিয়াই যাইবে? কিন্তু–

কস্তুরীবাঈকে আর একবার দেখিবার লোভ তাহার মনে কিরূপ দুর্বার লইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। না না—সে ফিরিয়াই যাইবে।

কিন্তু এ তো ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ নয়। তবে কেন বিজয়লাল এখানে আসিয়া থামিল? কৃষ্ণা কি তবে অন্য কোনো প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিয়াছে?

মনে মনে এইরূপ দড়ি টানাটানি চলিতেছে, এমন সময় কৃষ্ণার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা গেল—আসুন মহারাজ।

আর দ্বিধা করিবার পথ রহিল না। সঙ্কুচিত পদে গৌরী ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। কৃষ্ণা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিল, বলিল-মহারাজের জয় হোক। বিধি আজ অনুকূল, তাই গরীবের ঘরে মহারাজের পদার্পণ হল।

গৌরী গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল— কৃষ্ণা, আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল—তা তো চিঠিতেই জানিয়েছিলাম মহারাজ প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, সত্যি কি দরকার বল।

কৃষ্ণা আবার হাসিল, বলিল— বুঝতে পারেননি? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারপর বিজয়লালের দিকে ফিরিয়া কহিল— আপনারা দুজনে ততক্ষণ আমার বাগানে বসে আলাপ করুন, আমি মহারাজকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। রুদ্ররূপের মুখে ঈষৎ উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখিয়া কহিল ভয় নেই, একঘণ্টার মধ্যেই আমি মহারাজকে ফিরিয়ে এনে আপনার হেপাজাত করে দেব। —মহারাজ, আমার সঙ্গে চলুন। কৃষ্ণা ফটকের বাহির হইল।

প্রবল চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন সকল বন্ধন ছিড়িয়া তাহার অভিগামী হয়, গৌরীও তেমনি তাহার অনুবর্তী হইল। ফটক হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণা সম্মুখ দিকে চলিল। অল্পক্ষণ একটা সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া যাইবার পর গৌরী দেখিল, তাহারা কিস্তার তীরে পৌঁছিয়াছে। সম্মুখেই ছোট একটি পাথর। বাঁধানো ঘাট, ঘাটে একটি ডিঙি বাঁধা। মাঝি মাল্লা কেহ কোথাও নাই।

কৃষ্ণা সন্তর্পণে ক্ষুদ্র ডিঙিতে উঠিয়া গলুইয়ে বসিল, পাতলা লঘু দুইখানি দাঁড় হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—এবার আপনি আসুন, ঐদিকে বসুন।

গৌরী ডিঙিতে উঠিয়া বলিল— দাঁড় আমায় দাও।

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া হাসিল—কোথায় যেতে হবে আপনি তো জানেন না। আপনি দাঁড় নিয়ে কি করবেন? বলিয়া দাঁড় জলে ডুবাইল।

গৌরী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কৃষ্ণার দাঁড়ের আঘাতে ডিঙি পূর্বমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল— চুপ করে বসে কি ভাবছেন?

কিস্তার জলের দিকে তাকাইয়া গৌরী বলিল—কিছু না।

দাঁড় টানিতে টানিতে কৃষ্ণা বলিল— সেদিন আপনি আমাকে যে রকম শাসিয়েছিলেন, তাতে বুঝেছিলাম যে সখীকে দেখে আপনার আশা মেটেনি। তাই আজ সেদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ব্যবস্থা করেছি। খুশি হয়েছেন তো?

গৌরী চুপ করিয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল— তিনি জানেন?

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিল, বলিল— জানেন। ও-পক্ষেই যে আগ্রহ ও অধীরতা বেশী তাহা আর প্রকাশ করিল না।

গৌরীর বুকের ভিতরটা টলমল নৌকার মতই একবার দুলিয়া উঠিল; দুইহাতে নৌকার দুইদিকের কানা চাপিয়া ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাজবাটির প্রশস্ত ঘাটের পাশ দিয়া একশ্রেণী সঙ্কীর্ণ সোপান উঠিয়া গিয়াছে, কৃষ্ণা সেইখানে নৌকা ভিড়াইল। গৌরী ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিল, রাজপুরী অন্ধকার নিঃঝুম—কেবল দ্বিতলের একটি জানালা হইতে দীপালোক নির্গত হইতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কৃষ্ণা নিম্নস্বরে বলিল—এটি আমার নিজস্ব সিঁড়ি, একেবারে সখীর খাসমহলে গিয়ে উঠেছে।

সোপানশীর্ষে একটি মজবুত কাঠের দরজা; কৃষ্ণা আঁচল হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিল। কবাট উন্মুক্ত করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে বলিল—স্বাগত!

ভিতরে একটি অলিন্দ—অন্ধকার। কৃষ্ণা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল—আমার হাত ধরে আসুন।

অলিন্দ পার হইয়া একটি নাতিবৃহৎ ঘর। মেঝেয় গালিচা পাতা, গালিচার উপর একস্থানে পুরু গদির উপর মখমলের জাজিম, তাহার উপর মোটা মোটা মখমলের জরিদার তাকিয়া। আতরদান গোলাপপাশ ইত্যাদি ইতস্তত ছড়ানো একটি সোনার আলবোলার শীর্ষে সুগন্ধ তামাকুর ধুম ধীরে। ধীরে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। মাথার উপর দুইটি মোমবাতির ঝাড় স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতেছে। এই ঘরের আলোই গৌরী ঘাট হইতে দেখিতে পাইয়াছিল।

আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ড একবার ধ্বক ধ্বক করিয়া উঠিল, গলার পেশীগুলা কণ্ঠ আঁটিয়া ধরিল। সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিল–ঘরে কেহ নাই।

আপনি ততক্ষণ বসে তামাকু খান, আমি এখনি আসছি। বলিয়া গৌরীকে বসাইয়া হাসিমুখে কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

দুইখানা ঘরের পরেই কস্তুরীর শয়নকক্ষ। ঘর প্রায় অন্ধকার, কেবল এককোণে একটি বাতি জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর শয্যার দিকে নজর পড়িতেই দ্রুতপদে পালঙ্কের পাশে গিয়া বলিল–একি কস্তুরী! শুয়ে যে!

লাল চেলির পট্টবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কস্তুরী শুইয়া আছে, শুভ্র বালিশের উপর তাহার মুক্তাখচিত কবরীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণার সাড়া পাইয়া সে আরো গুটাইয়া শুইল, বালিশের ভিতর হইতে মৃদু রুদ্ধ স্বরে বলিল-না, কৃষ্ণা, আমি পারব না, তুই যা।

কৃষ্ণা শয্যার পাশে বসিয়া বলিল— সে কি হয় সখি! অতিথিকে ডেকে এনে এখন না বললে কি চলে? ওঠ।

কস্তুরী মাথা নাড়িয়া বলিল—না না, কৃষ্ণা, আমার ভারি লজ্জা করছে।

কৃষ্ণা বলিল–তা করুক। প্রথম প্রথম অমন একটু করে। চোখাচোখি হলেই সেরে যাবে।

না, আমি পারব না কৃষ্ণা। ছি, যদি বেহায়া মনে করেন।

কৃষ্ণা এবার রাগিল, বলিল—তবে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে কেন? আর আমাকেই বা পাগল করে তুলেছিলে কেন? মহামান্য অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে দেখা না করে ফিরিয়ে দেবে? তাতে তিনি কিছু মনে করবেন না?

কস্তুরী কাতরস্বরে বলিল— তুই রাগ করিসনি কৃষ্ণা! আমি যে পারছি না— দ্যাখ, আমার হাত-পা কাঁপছে। বলিয়া কৃষ্ণার হাত লইয়া বুকের উপর রাখিল।

কৃষ্ণা তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল—সখি, বুক কাঁপছে বলে ভয় করলে চলবে কেন? আজ প্রিয়তম তোমার ঘরে এসেছেন, আজ তো রোমে রোমে হরখিলা লাগবেই। আজ কি লজ্জা করে বিছানায় শুয়ে থাকতে আছে। ওঠ ওঠ সখি, ন যুক্তং অকৃতসৎকারং অতিথিবিশেষং উজঝিত্বা স্বচ্ছন্দতে গমন-থুড়ি শয়নম্। বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

কস্তুরী কৃষ্ণার কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপি চুপি বলিল— সেদিন আচঙ্কা দেখা হয়েছিল কিন্তু আজ এমনভাবে সেজেগুজে তাঁর কাছে যেতে বড্ড লজ্জা করবে যে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা বলিল— বেশ, আজ তোমার লজ্জাই দেবতাকে ভোগ দিও তাতেও ঠাকুর খুশি হবেন। আর দেরি কোরো না, তিনি কতক্ষণ একলাটি বসে আছেন।

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল— আচ্ছা—কিন্তু তুই থাকবি তো?

থাকব। যতক্ষণ তোমাদের বিয়ে না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।

আচ্ছা, তুই তবে এগিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।

দেখো, আবার শুয়ে পড়ো না কিন্তু। আর বরের জন্য নিজে হাতে করে পান নিয়ে এস। বলিয়া কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গৌরী সুকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল, কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল–কৃষ্ণা, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

অবাক হইয়া কৃষ্ণা তাহার মুখের পানে তাকাইল—সে কি মহারাজ! আপনি কি রাগ করলেন?

না না, কৃষ্ণা, তুমি আমার কথা বুঝবে না, শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

কিন্তু সখী যে এই এলেন বলে।

তিনি আসবার আগেই আমি যেতে চাই। চল। বলিয়া সে কৃষ্ণার হাত ধরিল।

কিন্তু আমি যে কিছুই–

বুঝবে না। তোমরা কেউ বুঝবে না। হয়তো কোনোদিন—কিন্তু এখন সে থাক। চল। কৃষ্ণাকে সে একরকম জোর করিয়াই দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অলিন্দের সম্মুখে পৌঁছিয়া সে একবার ফিরিয়া চাহিল। তাহার গতি শিথিল হইয়া গেল, বুকের ভিতর রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। ঘরের অপর প্রান্তে দ্বারের সম্মুখে কস্তুরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার হাতে পানের করস্ক, পরিধানে রক্তের মত রাঙা চেলি। চোখে ঈষৎ বিস্ময়ের স্থির দৃষ্টি।

গলার মধ্যে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া গৌরী মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর অন্ধের মত সেই অলিন্দের ভিতর দিয়া কৃষ্ণাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কৃষ্ণার হাত যে তাহার বজ্রমুঠিতে বাঁধা আছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

.

ধনঞ্জয়ের একটু ঢুল আসিয়াছিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রবেশ করিতেই তিনি ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরী কোনো কথা না বলিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মাথা হইতে পাগড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া গলার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—তারপর শুধু বলিলেন—হুঁ।

গৌরী কষায়িত চক্ষে একবার তাঁহার পানে চাহিল; যেন আর একটি কথা বলিলেই সে বাঘের মত তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

ধনঞ্জয় কিন্তু তাহাকে কিছু বলিলেন না, রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া তন্দ্রালস ভারি গলায় বলিলেন–রুদ্ররূপ, আজ তুমি পাহারায় থাক। আমি চললাম। বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধনঞ্জয় চলিয়া গেলে গৌরী সহসা রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া বলিল–রুদ্ররূপ, আজ আমাকে পাহারা দেবার দরকার নেই। তুমি যাও —শুধু আজকের রাত্রিটা আমাকে একলা থাকতে দাও। দোহাই তোমাদের।

গৌরীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা উগ্র বেদনা ছিল যে ক্ষণকালের জন্য রুদ্ররূপকে বিমূঢ় করিয়া দিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে সসম্ভ্রমে স্যালুট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পত্রাদি

বাতি নিবাইয়া গৌরী শয্যায় শয়ন করিল; অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না; মস্তিষ্কের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু যেন দুই বিপক্ষ দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে হানাহানি করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল।

বুকজোড়া এই অশান্ত অন্ধ সংগ্রাম যে কেবল একটিমাত্র দুষ্প্রাপ্য নারীকে কেন্দ্র করিয়া– তাহা ভাবিয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে একটা চাপা বেদনাবিদ্ধ শব্দ বাহির হইল— উঃ! কস্তুরী আজ বাসক-সজ্জায় সাজিয়া নববধুর মত দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর—সে তাহাকে দেখিয়াও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কর্তব্যবুদ্ধির সমস্ত সান্ত্বনা ছাপাইয়া এই দুঃসহ মনঃপীড়াই তাহার হৃৎপিণ্ডকে পিষিয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল—পলাইয়া যাই! চুপি চুপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের দেশে, নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়া যাই, যেখানে দাদা আছেন, বৌদিদি আছেন ভুলিতে পারিব না? এই মায়াপুরীর মোহময় ইন্দ্রজাল হইতে মুক্তি পাইব না? না পাই — তবু তো প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব; পরস্ত্রীলুব্ধ মিথ্যাচারীর জীবনযাপন করিতে হইবে না।

কিন্তু–

পলাইবার উপায় নাই। তাহার হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা। সে তত ঝিন্দের রাজা নয়—ঝিন্দের বন্দী। আরব্ধ কাজ শেষ না করিয়া, একটা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ওলটপালট করিয়া দিয়া সে পলাইবে কোন মুখ? নিজের দুঃখ তাহার যত মর্মভেদীই হোক, একটা রাজ্যকে বিপ্লবের কোলে তুলিয়া দিয়া ভীরুর মত পলাইবার অধিকার তাহার নাই; পলাইলে শুধু সে নয়, সমস্ত বাঙালী জাতির মুখে কালি লেপিয়া দেওয়া হইবে। —না, তাহাকে থাকিতে হইবে। যদি কখনো শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে পারে, তবে তাহার হাতে কস্তুরীকে তুলিয়া দিয়া মুখে হাসি টানিয়া বিদায় লইতে পারিবে–তার আগে নয়।

সমস্ত রাত্রি গৌরী ঘুমাইতে পারিল না; মোহাচ্ছন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবৎখানার বাজনা শুনিয়া গেল। ভোরের দিকে একটু নিদ্রা আসিল বটে, কিন্তু নিদ্রার মধ্যেও তাহার মন অশান্ত সমুদ্রের মত পাষাণ প্রতিবন্ধকে বারবার আছাড়িয়া পড়িয়া নিজেকে শতধা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

বেলা আটটায় সময় বজ্রপাণি আসিয়াছেন শুনিয়া সে জবাফুলের মত আরক্ত চোখ মেলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। চম্পা সংবাদ দিতে আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–কি চান তিনি?

চম্পা গৌরীর মুখের চেহারা দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গিন্নীপনা করিবার সাহসও আজ তাহার হইল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল— জানি না।

গৌরী বোধ করি বজ্রপাণিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি নিজেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌরীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—একি! আপনার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? শরীর কি অসুস্থ? চম্পা, ডাক্তার গঙ্গানাথকে খবর পাঠাও।

চম্পা গমনোদ্যত হইলে গৌরী বলিল–না না—ডাক্তার চাই না, আমি বেশ ভালই আছি। আপনি কি জরুরী কিছু বলতে চান?

বজ্রপাণি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন— হ্যাঁ— কিন্তু আপনার শরীর যদি–

গৌরী শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল–আপনি ও-ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মুখ-হাত ধুয়েই যাচ্ছি।–চম্পা, আমার জন্যে এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ তৈরি করে আনতে পার?

চম্পা একবার মাথা ঝুকাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আধঘণ্টা পরে কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌরী ভোজন কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রাতরাশ টেবলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু সে তাহা স্পর্শ করিল না। চম্পা থালার উপর সরবতের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল— বাদাম, মিছরি ও গোলমরিচ দিয়া প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই সহাস্যমুখে এক চুমুক পান করিয়া গৌরী বলিল— আঃ! চম্পা, তোমার জন্যেই ঝিন্দের রাজাগিরি কোনোমতে বরদাস্ত করছি; তুমি যেদিন বিয়ে করে বরের ঘরে চলে যাবে, আমিও সেদিন ঝি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাব।

চম্পার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সে বলিল— রাজবাড়ি ছেড়ে আমি একপাও নড়ব না— আপনি যদি তাড়িয়ে দেন তবুও না।

সরবতের পাত্রে আর এক চুমুক দিয়া গৌরী বলিল— তোমাকে রাজবাড়ি থেকে তাড়াতে পারি এত সাহস আমার নেই। বরঞ্চ তুমিই আমাকে তাড়াতে পার বটে। তুমি চলে গেলেই আমাকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যাতে না যাও, তার ব্যবস্থা আমায় করতে হচ্ছে। দেওয়ানজী, চম্পার বিয়ের আর কোনো কথা উঠেছে?

বজ্রপাণি অদূরে কৌচে বসিয়াছিলেন, বলিলেন— হ্যাঁ, ত্রিবিক্রম তো অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছেন—

তাঁকে চেষ্টা করতে বারণ করে দেবেন। চম্পার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব কি বল চম্পা?

চম্পা কিছুই বলিল না। বিবাহের ব্যবস্থা বাবাই করুন আর রাজাই করুন, বিবাহ জিনিসটাতেই তাহার আপত্তি। সে ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ভাল ফুটিল না।

রুদ্ররূপ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৌরী বলিল— আর, রুদ্ররূপেরও। একটা বিয়ে দিতে হবে। আমার আশেপাশে যারা থাকে তাদের আমি সুখী

দেখতে চাই। গৌরীর ঠোঁটের উপর দিয়া ক্ষণকালের জন্য যে ব্যথা-বিদ্ধ হাসিটা খেলিয়া গেল তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

কিন্তু গৌরীর কথার ইঙ্গিত রুদ্ররূপের কানে পৌঁছিল। তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল; সে ফৌজী কায়দায় শূন্যের দিকে তাকাইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। গৌরী নিঃশেষিত সরবতের পাত্র চম্পাকে ফেরত দিয়া মুখ মুছিয়া বলিল— এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক। দেওয়ানজী, আরম্ভ করুন।

বজ্রপাণি তখন কাজের কথা ব্যক্ত করিলেন। রাজবংশের রেওয়াজ এই যে, যুবরাজের তিলক সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর ভাবী যুবরাজ-পত্নীকে বংশের সাবেক অলঙ্কারাদি উপঢৌকন পাঠান হয়—এই সকল অলঙ্কার পরিয়া কন্যার বিবাহ হয়। এই প্রথা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই। শঙ্কর সিংকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, এই আশাতেই এতদিন বিলম্ব করা হইয়াছে। কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়; অদ্যই সমস্ত উপঢৌকন ঝড়োয়ায় পাঠানো প্রয়োজন। নচেৎ, এই ত্রুটির সূত্র ধরিয়া অনেক কথার উৎপত্তি হইতে পারে।

শুনিয়া গৌরী বলিল— বেশ তো। রেওয়াজ যখন, তখন করতে হবে বৈকি। এর জন্যে আমার অনুমতি নেবার কোনো দরকার ছিল না—আপনারা নিজেরাই করতে পারতেন। তা কে এসব গয়নাপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? এ বিষয়েও রেওয়াজ আছে নাকি?

ধনঞ্জয় বলিলেন— চম্পা নিয়ে যাবে। অবশ্য তার সঙ্গে রক্ষী থাকবে।

গৌরী বলিল— বেশ। রুদ্ররূপ চম্পার রক্ষী হয়ে যাক।–তাহলে দেওয়ানজী, আর বিলম্ব হবেন না–সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

বজ্রপাণি ও ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন। চম্পা মহানন্দে সাজসজ্জা করিতে গেল।

গৌরী মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া অনেকক্ষণ শুন্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর মনে মনে কেট সঙ্কল্প স্থির করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল সম্মুখের যায় কেবল রুদ্ররূপ পায়চারি করিতেছে। গৌরী অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিল। রুদ্ররূপ কাছে আসিলে বলিল–সর্দার কোথায়?

তিনি আর দেওয়ানজী তোশাখানার দিকে গেছেন।

গৌরী তখন গলা নামাইয়া বলিল— তুমি যাও, চম্পার কাছ থেকে চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে এস। চুপি চুপি, বুঝলে?

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল। সদর হইতে লেখার সরঞ্জাম না আনাইয়া চম্পার নিকট হইতে আনাইবার কারণ কি তাহাও আন্দাজ করিয়া লইল। অন্দরের যে অংশটায় চম্পার মহল সেখানে রুদ্ররূপ পূর্বে কখনো পদার্পণ করে নাই; একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

সে ঠিকানা জানিয়া লইল। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। একটু ইতস্তত করিয়া দরজায় টোকা মারিল, তারপর ভাঙা গলায় ডাকিল— চম্পাদেঈ!

কবাট খুলিয়া একজন দাসী মুখ বাড়াইল। রুদ্ররূপকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল— কাকে দরকার সর্দারজী!

চম্পাদেঈ আছেন?

আছেন। ঝড়োয়ায় যেতে হবে তাই তিনি সাজগোজ করছেন।

রুদ্ররূপ বড় বিপদে পড়িল। চম্পাকে সে মনে মনে ভারি ভয় করে, এ সময় তাহাকে ডাকিলে সে যে চাটিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে রাজার হুকুম। সাহসে ভর করিয়া যে বলিল–তাঁর সঙ্গে জরুরী দরকার আছে, তাঁকে খবর দাও। আর, তুমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাও।

পরিচারিকা চম্পার খাস চাকরানী, বাপের বাড়ি হইতে সঙ্গে আসিয়াছে; সে একটু আশ্চর্য হইল। একে তো অন্দরমহলে পুরুষের গতিবিধি অত্যন্ত কম, তাহার উপর রুদ্ররূপের অদ্ভুত হুকুম শুনিয়া সে থতমত খাইয়া বলিল— কিন্তু, এত্তেলা তাঁকে আমি এখনি দিচ্ছি। কিন্তু তিনি এখন সিঙাব করছেন—

রুদ্ররূপ একটু গরম হইয়া বলিল—তা করুন—

ভিতর হইত চম্পার কণ্ঠ শুনা গেল—রেওতি, কে ও? কি চায়?

রেবতী দ্বার ভেজাইয়া দিয়া কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে গেল। রুদ্ররূপ অস্বস্তিপূর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে আবার দরজা খুলিল, রেবতী বলিল— আসুন।

রুদ্ররূপ সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর আর একটি ঘর, মাঝখানে পদা। এই পদার ভিতর হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া চম্পা দাঁড়াইয়া আছে, রুদ্ররূপকে দেখিয়াই বলিল— তোমার আবার এই সময় কি দরকার হল? শিগগির বল; আমার সময় নেই। এখনো চুল বাঁধতে বাকি।

রুদ্ররূপ রেবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল— তুমি বাইরে যাও। –চম্পার প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল— ভারী গোপনীয় কথা।

চম্পা মুখে অধীরতাসূচক একটা শব্দ করিল। রেবতীকে মাথা নাড়িয়া ইশারা করিতেই সে বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপনীয় কথা বলিতে হইবে, চিৎকার করিয়া বলা চলে না। রুদ্ররূপ কৈ মাছের মত কোণাচে ভাবে চম্পার নিকটবর্তী হইল। চম্পা চোখে বোধ করি কাজল পরিতেছিল,

প্রসাধন এখনো শেষ হয় নাই; সে কাজলপরা বামচক্ষে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল— কি হয়েছে?

রুদ্ররূপের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে একবার গলা খাঁকারি দিয়া চম্পার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গদগদ স্বরে বলিল— রাজা চিঠির কাগজ চাইছেন।

এই তোমার গোপনীয় কথা! রাগের মাথার চম্পা পর্দা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল; আবার তখনি নিজের অসম্পূর্ণ বেশবিন্যাসের দিকে তাকাইয়া পদার ভিতর লুকাইল। ওড়না গায়ে নাই শাড়ির আঁচলটাও মাটিতে লুটাইতেছে; এ অবস্থায় রুদ্ররূপের সম্মুখীন হওয়া চলে না—তা যতই রাগ হোক।

রুদ্ররূপ কাতরভাবে বলিল— সত্যি বলছি চম্পা, রাজা বললেন, তোমার কাছ থেকে চুপি চুপি চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে আনতে। বোধ হয় চিঠি লিখবেন।

তুমি একটা—তুমি একটা-চম্পা হাসিয়া ফেলিল— তুমি একটি বুদ্ধু।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রুদ্ররূপ বলিয়া ফেলিল—আর তুমি একটি ডালিম ফুল। বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

চম্পা কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার সিন্দুরের মত মুখের পানে তাকাইয়া রহিল; তারপর পর্দা আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল।

রুদ্ররূপ ঘর্মাক্ত দেহে ভাবিতে লাগিল— পলায়ন করিবে কিনা। কিছুক্ষণ পরে চম্পার হাত পদার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—এই নাও।

কাগজ কলম লইয়া মুখ তুলিতেই রুদ্ররূপ দেখিল, পদার ফাঁকে কেবল একটি কাজলপরা চোব তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ভড়কানো ঘোড়ার মত সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল; হোঁচট খাইতে বাইতে রাজার কাছে ফিরিয়া গেল।

লেখার সরঞ্জাম লইয়া গৌরী বলিল— তুমি পাহারায় থাক। যদি সর্দার কিম্বা আর কেউ আসে, আগে খবর দিও।

রুদ্ররূপকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া গৌরী চিঠি লিখিতে বসিল। দুইখানা কাগজ ছিড়িয়া ফেলিবার পর সে লিখিল :

কৃষ্ণা,

তোমার কাছে আমার অপরাধ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে; তবু যদি সম্ভব হয় ক্ষমা কোরো। কস্তুরী কি খুব রাগ করেছেন? তাঁকে বোলো, আমি অতি অধম, তাঁর অভিমানের যোগ্য নই। এমন কি, তাঁর হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি আমাকে ভুলে যেতে পারবেন না কি? চেষ্টা করলে হয়তো পারবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন সেই চেষ্টা করেন। ইতি—

শঙ্করসিং নামধারী হতভাগ্য

চিঠি লিখিয়া গৌরী নিজের কোমরবন্ধের মধ্যে খুঁজিয়া রাখিল। তারপর চম্পা যখন সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া তাহার হুকুম লইতে আসিল, তখন সে চিঠিখানা তাহার হাতে খুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল-যাও, কৃষ্ণার হাতে চিঠি দিও।চম্পা বুকের মধ্যে চিঠি লুকাইয়া রাখিল।

অতঃপর শোভাযাত্রা করিয়া উপঢৌকনবাহীর দল যাত্রা করিল। চারিটি সুসজ্জিত হাতি; প্রথমটির পৃষ্ঠে সোনালী হাওদায় সুক্ষ্ম মলিনের ঘেরাটোপের মধ্যে চম্পা বসিল। বাকী তিনটিতে অলঙ্কারের পেটারি উঠিল। ত্রিশজন সওয়ার লইয়া রুদ্ররূপ ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পশ্চাতে একদল যন্ত্রবাদক ঝলমলে বেশভূষা পরিয়া অতি মিঠা সুরে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে অনুসরণ করিল।

তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া গৌরী, ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি বৈঠকে আসিয়া বসিলেন। বাহিরের কেহ ছিল না; অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ একথা-সেকথা হইবার পর গৌরী সহসা বলিয়া উঠিল—ভাল কথা, সর্দার, ওরা আমার নাম-ধাম পরিচয় সব জানতে পেরে গেছে।

ধনঞ্জয় চকিত হইয়া বলিলেন–কি রকম?

গতরাত্রে প্রহ্লাদ দত্তের দোকানে ও উদিতের বাগানবাড়ির সম্মুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, গৌরী সব বলিল। টেলিগ্রামখানাও দেখাইল। দেখিয়া শুনিয়া ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে ধনঞ্জয় বলিলেন–হুঁ, ওরাই আমাদের সব খবর পাচ্ছে দেখছি, আমরা ওদের। সম্বন্ধে কিছুই পাচ্ছি না। যাহোক, ঐ হতভাগা স্বরূপদাসটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে আনতে হচ্ছে; ওই হল ওদের গুপ্তচর! আর প্রহ্লাদ দত্ত যখন এর মধ্যে আছে, তখন তাকেও সাপটে নিতে হবে। এরাই উদিতের হাত-পা, এদের শায়েস্তা না করতে পারলে, উদিতকে জব্দ করা যাবে না। বলিয়া বজ্রপাণির দিকে চাহিলেন।

বজ্রপাণি ঘাড় নাড়িলেন–স্বরূপদাসকে সহজেই গ্রেপ্তার করা যাবে। স্টেট রেলওয়ের চাকর, বিনা অনুমতিতে স্টেশন ছেড়েছিল এই অপরাধে তার চাকরি তো যাবেই, তাকে জেলে পাঠানোও চলবে। কিন্তু প্রহ্লাদ সাধারণ দোকানদার—তাকে কোন্ অজুহাতে দেওয়ান জ্রু কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ধনঞ্জয় বলিলেন–যাহোক, কোতোয়ালীতে খবর দিই, তারা স্বরূপদাসকে ধরুক, আর আপাতত প্রহ্লাদের ওপর নজর রাখুক – তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

এই সময় একজন দ্বাররক্ষী আসিয়া খবর দিল যে, শহর হইতে এক দোকানদার মহারাজের ক্রীত জিনিসপত্র পাঠাইয়াছে। ধনঞ্জয় সপ্রশ্ননেত্রে গৌরীর পানে তাকাইলেন, গৌরী বলিল–হ্যাঁ, প্রহ্লাদের দোকানে কিছু জিনিস কিনেছিলাম। এখানেই আনতে বল।

একখানা বড় চাঁদির পরাতে রেশমের খুঞ্চেপোষ ঢাকা দ্রব্যগুলি লইয়া ভৃত্য উপস্থিত হইল। আবরণ খুলিয়া সকলে সুদৃশ্য শৌখিন জিনিসগুলি দেখিতে লাগিলেন। গৌরী দেখিল, জিনিসগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাতির দাঁতের কৌটা রহিয়াছে, যাহা সে কেনে নাই। সেটা তুলিয়া লইয়া ঢাকনি খুলিতেই দেখিল, তাহার ভিতরে একখানি চিঠি।

গৌরী প্রথমে ভাবিল, পণ্যদ্রব্যগুলির মূল্য তালিকা; কিন্তু চিঠি খুলিয়া দেখিল— বাংলা চিঠি। সবিস্ময়ে পড়িল :

দেবপাদ মহারাজ,

আপনাকে বাংলায় চিঠি লিখিতেছি যাহাতে অন্য কেহ ও চিঠির মর্ম বুঝিতে না পারে। আপনি কে তাহা আমি জানি।

কাল আপনাকে স্বচক্ষে দেখিয়া ও আপনার সহিত কথা কহিয়া আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি এতদিন অন্য পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমি বাঙালী। আমি যদি আপনাকে সাহায্য না করি তবে এই বিদেশে আর কে করিবে। তাই আজ হইতে আমি ও-পক্ষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে পারিব না; যদি উহারা আমায় সন্দেহ করে তাহা হইলে আমার জীবন সঙ্কট হইয়া পড়িবে, আপনি বা আর কেহই আমাকে রক্ষা করিতে

পারিবে না। আমি গোপনে যতদূর সম্ভব আপনাকে সাহায্য করিব। ও-পক্ষের অনেক খবর আমি পাই—প্রয়োজন মনে হইলে আপনাকে জানাইব।

আপনাকে চিঠি লেখা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আরও বিপজ্জনক। তাই চিঠিতেই সংক্ষেপে যাহা জানি আপনাকে জানাইতেছি। আপনি যদি আরো কিছু জানিতে চাহেন, এই কৌটায় চিঠি লিখিয়া কৌটা ফেরত পাঠাইবেন বলিয়া দিবেন কৌটা পছন্দ হইল না।

উপস্থিত সংবাদ এই—আপনারা যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে চান তবে শীঘ্র শক্তিগড়ে গিয়া সন্ধান করুন। তিনি সেখানেই আছেন। কেল্লার পশ্চিম দিকের প্রাকারের নীচে নদীর জলের চার-পাঁচ হাত উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালা আছে। ঐ জানালা যে ঘরের—সেই ঘরে শঙ্কর সিং বন্দী আছেন। প্রায় সকল সময়েই তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখা হয়। তাছাড়া, একজন লোক সর্বদা পাহারায় থাকে।

এই চিঠি অনুগ্রহপূর্বক পত্রপাঠ ছিড়িয়া ফেলিবেন। মহারাজের জয় হোক। ইতি–

পরম শুভাকাঙক্ষী চরণাশ্রিত শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত

গৌরী চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া ভৃত্যকে বলিল— এ সব জিনিস তুমি চম্পাদের মহলে পাঠিয়ে দাও। যে-লোক এগুলো নিয়ে এসেছে, তাকে বল, যদি কোনো জিনিস অপছন্দ হয় ফেরত পাঠানো হবে।

ভৃত্য যো হুকুম বলিয়া পরাত হস্তে প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় ও বজ্রপানি দুইজনেই গৌরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন; ভৃত্য অন্তর্হিত হইলে ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন চিঠিতে কি আছে?

গৌরী বলিল–আগে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এস।

দরজা বন্ধ করিয়া তিনজনে ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিলেন। গৌরী তখন প্রহ্লাদের চিঠি পড়িয়া শুনাইল। তারপর তিনজনে মাথা একত্র করিয়া নিম্নস্বরে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হইল–কোনো ছুতায় শক্তিগড়ের নিকটে গিয়া আড্ডা গাড়িতে হইবেরাজধানীতে বসিয়া থাকিলে কোনো কাজ হইবে না। উদিত সিং কেল্লায় তাহাদের ঢুকিতে না দিতে পারে, কিন্তু কেল্লার বাহিরে যদি তাঁহারা তাঁবু ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কিছু করিতে পারিবে না। তখন সেখানে বসিয়া স্থান কাল ও সুযোগ বুঝিয়া শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিবার একটা মতলব বাহির করা যাইতে পারে।

উপস্থিত দেওয়ান বজ্রপাণি রাজধানীতে থাকিয়া এদিক সামলাইবেন। ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ আরো সহচর সঙ্গে লইয়া গৌরীর সঙ্গে থাকিবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া যখন তাঁহারা শ্রান্তদেহে গাত্রোত্থান করিলেন তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তখনো তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন না। এই সময় সদরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া ধনঞ্জয় জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ময়ূরবাহন তাহার কালো ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতেছে। তিনি চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন— ময়ূরবাহন এসেছে। বসুন—উঠবেন না।

তিনজনে আবার উপবিষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই দৌবারিক খবর দিল, ময়ূরবাহন জরুরী কাজে মহারাজের দর্শন চান।

গৌরী বলিল— নিয়ে এস।

ময়ূরবাহন প্রবেশ করিল। তাহার মাথার পাগড়ির খাঁজে ধুলা জমিয়াছে পাতলা গোঁফের উপরেও ধুলার সূক্ষ্ম প্রলেপ; দেখিলেই বোঝা যায়, সে শক্তিগড় হইতে সোজা ঘোড়ার পিঠে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অঙ্গে বা মুখের ভাবে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই। ঘরে ঢুকিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট তনজনকে দেখিয়া সে সকৌতুকে হাসিয়া অবহেলাভরে একবার ঘাড় নীচু করিয়া অভিবাদন। করিল। বলিল–সপার্ষদ মহারাজের জয় হোক।

রাজার সম্মুখে আদব কায়দার যে রীতি আছে তাহা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন না করিয়াও ধৃষ্টতা প্রকাশ করা যায়। ময়ূরবাহনের বাহ্য শিষ্টাচারের ক্ষীণ পর্দার আড়ালে যে বেপরোয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার দুই চক্ষে দুষ্ট কৌতুক নৃত্য করিতেছিল; রক্তের মত রাঙা ওষ্ঠাধরে যে হাসিটা খেলা করিতেছিল, তাহা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ। তাহার কথাগুলার অন্তর্নিহিত গুপ্ত শ্লেষ সকলের মর্মে গিয়া বিঁধিল।

গৌরী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে ময়ূরবাহনকে অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু তাহার এই স্পর্ধা গৌরীর গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল; সে অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলল–কি চাও তুমি? যা বলতে চাও শীঘ্র বল, সময় নষ্ট করবার আমাদের অবকাশ নেই।

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি আরো বাঁকা হইয়া উঠিল; সে কৃত্রিম বিনয়ের একটা ভঙ্গি করিয়া বলল–ঠিক বলেছেন মহারাজ; রাজ্য ভোগ করবার অবকাশ যখন সংক্ষিপ্ত তখন সময় নষ্ট করা বোকামি। আমি কারুর সুখভোগে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না, আমার জীবনের উদ্দেশ্যই তা নয়। কুমার উদিত সিং আপনাকে একটি নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন, সেইটে হুজুরে দাখিল করেই আমি ফিরে যাব। কোমরবন্ধ হইতে একখানা চিঠি লইয়া গৌরীর সম্মুখে ধরিল।

গৌরী নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ ময়ূরবাহনের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু ময়ূরবাহনের চোখের পল্লব পড়িল না। তখন সে চিঠি লইয়া মোহর ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে লেখা ছিল :

ওরে বাঙালী নটুয়া, তুই কি জন্য মরিতে এদেশে আসিয়াছিস? তোর কি প্রাণের ভয় নাই! তুই শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যা— নচেৎ পিঁপড়ার মত তোকে টিপিয়া মারিব।

তোর নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া তুই নটুয়ার নাচ দেখা–পয়সা মিলিবে। এদেশে তোর দর্শক মিলিবে না।

পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আরক্ত চক্ষে বলল—এ কি চিঠি? বলিয়া কম্পিতহস্তে কাগজখানা ময়ূরবাহনের সম্মুখে ধরিল।

ময়ূরবাহন বিস্ময়ের ভান করিয়া চিঠিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর যেন ভুল করিয়াছে এমনিভাবে বলিল–ওঃ তাইতো! ও চিঠিখানা আপনার জন্য নয়, ভুলক্রমে আপনাকে দিয়ে ফেলেছি। এই নি আপনার চিঠি! বলিয়া আর একখানা চিঠি বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। প্রথম চিঠিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া অবহেলাভরে গোলা পাকাইয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল।

গৌরী অসীমবলে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল— তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার।

ময়ূরবাহন বলিল— নিশ্চয়। শুধু বুড়ো মন্ত্রীর কাছে একটা পরামর্শ নেওয়া বাকি আছে। –দেওয়ানজী, বলতে পারেন, যারা রাজ-সিংহাসনে বিদেশী মর্কটকে বসিয়ে নাচ দেখে তাদের শাস্তি কি?

গৌরী আর ধৈর্য রাখিতে পারিল না, গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জিয়া উঠিল—চোপরও বদজাত কুকুরের বাচ্চানইলে তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার ডান হাতখানা সরীসৃপের মত কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সাপের মত চোখ দুইটা গৌরীর মুখের উপর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিল। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মুষ্টিতে যে জিনিসটা ছিল তাহা দেখিবামাত্র ময়ূরবাহনের হাত তরবারি হইতে সরিয়া গেল। সে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, সেই নির্ভীক বেপরোয়া হাসি! তারপর দেহের একটা হিল্লোলিত ব্যঙ্গপূর্ণ ভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ঘোড়র ক্ষুরের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। বজ্রপাণি এইবার সেটা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন।

স্বস্তি শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর সিং দেবপাদ জ্যেষ্ঠের নিকট অনুগত অনুজ শ্রীউদিত সিংয়ের সানুনয় নিবেদন—আমার জমিদারীতে সম্প্রতি হরিণ শুকর প্রভৃতি অনেক শিকার পড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও যদি মহারাজ মৃগয়ার্থ শুভাগমন করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। অলমিতি।

বজ্রপাণি পত্রটি নিঃশব্দে ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। গৌরী কিছুক্ষণ অসহ্য ক্রোধে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিল। ময়ূরবাহনের ধৃষ্টতা তাহার দেহ-মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; নূতন চিঠিতে কি আছে না আছে তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে ঝাঁপ

চম্পা যখন ঝড়োয়া হইতে ফিরিল তখন অপরাহ্ন। কিস্তার ধারের বারান্দায় গৌরী মেঘাচ্ছন্ন মুখে বুকে হাত বাঁধিয়া পদচারণ করিতেছিল–সঙ্গে কেহ ছিল না। ময়ূরবাহনের শ্লেষ-বিদ্রূপ একটা কাজ করিয়াছিল; গৌরীর মনে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে যে আলস্যের ভাব আসিয়াছিল তাহাকে সে চাবুক মারিয়া একটু বেশী মাত্রায় চাঙ্গা করিয়া দিয়া গিয়াছিল। অপমান জর্জরিত বুকে গৌরী। ভাবিতেছিল— প্রাণ যায় যাক্, শঙ্কর সিংকে ঐ ধৃষ্ট কুকুরগুলার কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আর কলা-কৌশল নয়, রক্তে সাঁতার দিয়া যদি এ কাজ সিদ্ধ হয়, তাও সে করিবে। ময়ূরবাহনের মত স্পর্ধিত শয়তানগুলাকে সে দেখাইয়া দিবে— বাঙালী কোন্ ধাতুতে নির্মিত।

বাঙালী নটুয়া! ঐ কথাটাতেই তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। ময়ূরবাহন ও উদিত সিংয়ের রক্ত দিয়া এ অপমানের লাঞ্ছনা যতক্ষণ সে মুছিয়া দিতে না পারিবে ততক্ষণ যে তাহার প্রাণে শান্তি নাই, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এই প্রতিহিংসা পিপাসার কাছে নিজের প্রাণের মূল্যও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল।

চম্পার পায়জনিয়ার আওয়াজ শুনিয়া গৌরী রক্তরাঙা চিন্তার আবর্ত হইতে উঠিয়া আসিল। চম্পা কোনো কথা না বলিয়া নিজের আঙরাখার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। চিঠির উত্তর গৌরী প্রত্যাশা করে নাই, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া

সেটা খুলিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরে নাগরার শব্দ শুনা গেল। গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা পকেটে পুরিল।

ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন; তাঁহার হাতে একখানা কাগজ। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল কি সর্দার?

সর্দার বলিলেন–উদিতের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে চিঠি লেখা হল। এটাতে সহি দস্তখত করে দিন।

গৌরী চিঠিখানা পড়িয়া দস্তখত করিতে করিতে বলিল— কবে যাওয়া স্থির করলে?

এখনো স্থির করিনি। আপনি কবে বলেন?

কালই। আর দেরি নয় সদর, যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে আমি যেতে চাই, তা সে যেখানেই হোক–

ধনঞ্জয় চকিতে চম্পার দিকে ফিরিয়া বলিলেন–চম্পা, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, কাপড়-চোপড় ছাড় গিয়ে।

চম্পা প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় বলিলেন— চম্পা জানে না। যাহোক, কি বলছিলেন?

বলছিলাম, যেখানে হোক এবার আমি যেতে চাই তা পরলোকে হলেও দুঃখ নেই। মনে একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি যে আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধের ঘোড়ার মত আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে; তোমাদের আস্তাবল থেকে তাকে এবার ছেড়ে দাও সে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াক। তারপর যা হবার হবে। যদি মৃত্যুই আসে তাতে আক্ষেপ করবার কিছু নেই; কারণ, জীবনটাকে আঙুরের মত তুলোর পেটারির মধ্যে ঢেকে রেখে বেঁচে থাকাকে আমি বেঁচে থাকা মনে করি না।

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া দুই হাতে দুই স্কন্ধ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন— রাজা, আজ আপনার মন ভাল নেই! মৃত্যুকে কোন্ মরদ পরোয়া করে? মৃত্যু আমাদের কাছে খেলার বস্তু, উপহাসের বস্তু-তার কথা বেশী চিন্তা করলে তাকে বড় করে তোলা হয়। সুতরাং মৃত্যুর কথা আমরা ভাবব না; আমরা ভাবব শুধু কাজের কথা, কর্তব্যের কথা। যে দুশমন আমাদের বাধা দিয়েছে, অপমান করেছে, তাদের বুকে পা দিয়ে কি করে আমরা তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব— এই হবে আমাদের চিন্তা। শত্রুর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে যারা নিজের মৃত্যু চিন্তা করে তারা তো কাপুরুষ; বীর যারা তারা শত্রুর মৃত্যু চিন্তা করে।

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল— সেই চিন্তাই আমি করছি সর্দার এবং যতক্ষণ না চিন্তাকে কাজে পরিণত করতে পারব ততক্ষণ আমার রক্ত ঠাণ্ডা হবে না।

ধনঞ্জয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—ব্যস! এই কথাই তো আমরা আপনার মুখে শুনতে চাই। দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর আপনি— ঝিন্দে এসে আপনি যদি কারুর সামনে মাথা হেঁট শুরন তাহলে তাঁর রক্তের অপমান হবে।

গৌরীর মুখে এতক্ষণে সত্যকার হাসি ফুটিল; সে বলিল— সর্দার! আজ নিয়ে তুমি তিনবার দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম করলে। এবার কিন্তু তোমাকে বলতে হচ্ছে, ঝিন্দের সঙ্গে কালীশঙ্করের। সম্বন্ধ কি এবং কেনই বা তাঁর বংশধর ঝিন্দে এসে মাথা উঁচু করে চলবে।

মাথা উঁচু করে চলবে তার কারণ কিন্তু আজ নয়, সে গল্প আর একদিন বলব। এখন অনেক কাজ। গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া বলিলেন-তাহলে কালই যাওয়া স্থির? সেই রকম বন্দোবস্ত করি?

হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা। উদিত খামকা আমায় শক্তিগড়ে নেমন্তন্ন করলে তার উদ্দেশ্য কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?

আপনি পেরেছেন?

বোধ হয় পেরেছি। আকস্মিক দুর্ঘটনা—কেমন?

হুঁ-আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তা হবে না। বলিয়া ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন।

গৌরী দুইবার বারান্দায় পায়চারি করিল, তারপর পকেটে হাত দিয়া দেখিল চম্পার আনীত চিঠিখানা এখনো খোলা হয় নাই। সে একবার চারিদিকে তাকাইল— কেহ কোথাও নাই। একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু এখানে চিঠি খুলিয়া পড়িতে ভরসা হইল না– হয়তো এখনি কেহ আসিয়া পড়িবে।

নিজের ঘরে গিয়া গৌরী জানালার ধারে দাঁড়াইল— ঠিক জানালার নীচে দিয়াই কিস্তার গাঢ় নীল জল বহিয়া যাইতেছে— কলকল ছলছল শব্দ করিতেছে। গৌরী কম্পিতবক্ষে চিঠি বাহির করিল, তারপর ধীরে ধীরে মোহর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কৃষ্ণা লিখিয়াছে :

স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিংহের চরণাম্বুজে দাসী কৃষ্ণাবাঈর শতকোটি প্রণাম। আপনার লপির মর্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। আপনি অনুরোধ করিয়াছেন, সখী যেন আপনাকে ভুলিয়া যান। প্রথমে মন কাড়িয়া লইয়া পরে ভুলিয়া যাইতে বলা— মহারাজের এ পরিহাস উপভোগ্য বটে। আগে আমার সখীর মন ফিরাইয়া দিন, তারপর ভুলিয়া যাইবার কথা ভাবা যাইবে। কিন্তু তাহাও কয় দিনের জন্য? আপনার কি আদেশ, বিবাহের পরও সখী আপনাকে ভুলিয়া থাকিবেন?

বুঝিতেছি, সখীর মনে ব্যথা দিয়া আপনি নিজেও কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? যাঁহার মানভঞ্জন করিলে দুইজনেরই মনের কষ্ট দূর হইবে তিনি তো

কাছেই রহিয়াছেন–মাঝে শুধু ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান। অবশ্য একটা কথা গোপনে আপনাকে বলিতে পারি, মানভঞ্জনের পূর্বেই আপনার পত্র দর্শনে সখীর অর্ধেক অভিমান দূর হইয়াছে। মুখে হাসি ফুটিয়াছে; শুধু তাই নয় গানও ফুটিয়াছে। শুনিতে পাইতেছি তিনি পাশের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর মৃদুস্বরে গান

করিতেছেন। গানটি কী শুনিবেন? মীরার দোঁহা—

মেরে জনম মরণ কী সাথী
তোহে ন বিসঁরি দিন রাতি

আপনার ভুলিয়া যাওয়ার অনুরোধের জবাব পাইলেন তো? আপনি কি আমার প্রিয়সখীকে গুণ করিয়াছেন? যাঁর অভিমান শত সাধ্যসাধনাতে ভাঙে না, আপনার এতটুকু চিঠির অনুতাপে সেই রাজরানী গলিয়া জল হইয়া গেলেন?

ভাল কথা, আপনি বৈদ্যুতিক আলোটা কাল রাত্রে ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, সখী সেটিকে দখল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আজ রাত্রে বিশ্রামের পূর্বে নিজের শয়নকক্ষের জানালা হইতে তাহার আলো ফেলিয়া দেখিবেন, কিস্তার ব্যবধান পার হইয়া সে-আলো আপনার জানালা পর্যন্ত পৌঁছায় কিনা। আপনার শয়নকক্ষের জানালা যে সখীর শয়নকক্ষের জানালার ঠিক মুখোমুখি তাহা চম্পা বহিনের মুখে জানিয়া লইয়াছি। মধ্যে কেবল ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান।

অলমিতি।

.

রাত্রি দশটার মধ্যে ঝিন্দের রাজপুরী নিশুতি হইয়া গিয়াছিল। কাল প্রভাতেই শক্তিগড় যাত্রা করিতে হইবে, তাই ধনঞ্জয় সকাল সকাল বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন; কেবল রূদ্ররূপ নিয়ম মত শয়নকক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল।

দীপহীন কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া গৌরী বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া ছিল। কিস্তার জলে ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদের আলো পড়িয়া সোনালী জরির মত কাঁপিতেছিল। নদীর উপর। নৌকার যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল কিস্তার খরস্রোত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে—সেই মহাপ্রপাতের মুখে যেখান হইতে সে ফেনহাস্যে উন্মুখর কল্লোলে নীচের উপত্যকার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; যেন এমনি করিয়া তটহীন শূন্যতায় নিজেকে নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়াই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা!

গৌরী ভাবিতেছিল— আজ রাত্রিটা শুধু আমার! কাল কোথায় থাকিব, বাঁচিয়া থাকিব কিনা কে জানে? যদি মরিতেই হয়, মৃত্যুপথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইব না? কস্তুরীর মুখের দুইটি কথা—তার গলা এখনো ভাল করিয়া শুনি নাই—শেষবার শুনিয়া লইব না? ইহাতে কাহার কি ক্ষতি?

মেরে জনম মরণ কী সাথী—কথাগুলি গৌরীর স্নায়ুতন্ত্রীর উপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে— তোহে ন বিসরি দিন রাতি-—দিবারাত্রি তোমাকে ভুলিতে পারি না। কাল গৌরী তাহার নবোদ্ভিন্ন অনুরাগ-ফুলটিকে আঘ্রাণ না করিয়া অবহেলাভরে চলিয়া আসিয়াছিল, তবু সে অভিমান ভুলিয়া গাহিয়াছে—তোহে ন বিসরি দিন রাতি। কাবায় বন্ধ গোলাপ আতরের চাপা গন্ধের মত এই অনুভূতি তাহার দেহের সীমা ছাপাইয়া যেন অন্ধকার ঘরের বাতাসকে পর্যন্ত উন্মাদ করিয়া তুলিল।

কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে। তবে? এখন আর সাবধান হইয়া লাভ কি? যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে— এখন কর্তব্যবুদ্ধির দোহাই দিয়া সাধু সংযমী সাজিয়া সে কাহাকে ঠকাইবে? একদিন তিক্ত বিষের পাত্র হতো তাহাকে কণ্ঠ ভরিয়া পান করিতে হইবে; তবে এখন অমৃতের পাত্র হাতের কাছে পাইয়া সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবে কেন?

ঝড়োয়ার প্রাসাদের দীপগুলি ক্রমে নিবিয়া গেল— কেবল একটি মৃদু বাতি দ্বিতলের একটি গবাক্ষ হইতে দেখা যাইতে লাগিল। গৌরী নির্নিমেষ চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চাহিয়া চাহিয়া এক সময় তাহার মনে হইল, যেন গবাক্ষের সম্মুখে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদূর হইতে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু তাহার মনে হইল— এ কস্তুরী। কিছুক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ বিদ্যুতের টর্চ জ্বলিল; কিস্তার জলের উপর এদিক ওদিক আলো ফেলিয়া তাহার জানালার উপর আসিয়া স্থির হইল। আলো

অবশ্য অতি অস্পষ্ট, কেবল নীহারিকার মত একটা প্রভা গৌরীর মুখখানাকে যেন মণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া দিল।

জানালার বাহির পর্যন্ত ঝুঁকিয়া গৌরী হাত নাড়িল। তৎক্ষণাৎ আলো নিবিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে আবার জ্বলিল, আবার তখনি নিবিয়া গেল। আলোকধারিণী যেন গৌরীর সহিত কৌতুক করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী ক্ষণকাল হেঁটমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সন্তর্পণে দ্বারের কাছে গিয়া পর্দা ঈষৎ সরাইয়া উঁকি মারিল। রুদ্ররূপ দূরের একটা বদ্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া। না জানি কিসের স্বপ্ন দেখিতেছে। গৌরী নিঃশব্দে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল; তারপর আবার জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় আবার দুই-তিনবার দূর গবাক্ষে আলো জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। গৌরী আর দ্বিধা করিল। তাহার প্রিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, এস এস বলিয়া বারবার আহ্বান করিতেছে। সে মনে মনে। উচ্চারণ করিল— কস্তুরী! কস্তুরী!

গায়ের জামাটা সে খুলিয়া ফেলিল। একটা পাগড়ির কাপড় জানালার পাশে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বাহিরের দিকে ঝুলাইয়া দিল। তারপর নগ্নদেহে সেই রঞ্জু বহিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া কিস্তার। জলে নিজেকে নামাইয়া দিল!

.

ঝড়োয়ার রাজপুরী নিস্তব্ধ—অন্ধকার। কেবল কস্তুরীর ঘরে একটি মৃদু দীপ জ্বলিতেছে। দীপের আলোকে ঘরটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—শুধু একটি স্নিগ্ধ ছায়াময় স্বচ্ছতার সৃষ্টি করিয়াছে।

পালঙ্কের ঠিক পাশেই মেঝেয় রেশমের গালিচার উপর কস্তুরী একটি হাত মাটিতে রাখিয়া হেঁটমুখে বসিয়া ছিল। গৌরী একটা শাল সিক্তদেহে জড়াইয়া পালঙ্কের উপর বাম বাহু রাখিয়া কস্তুরীর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। অদূরে পদাটাকা দ্বারের পাশে কৃষ্ণা চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়াছে। জল হইতে উঠিবার পর গৌরীকে লইয়া কৃষ্ণা যখন কস্তুরীর ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন গুটিকয়েক কথা হইয়াছিল; কৃষ্ণা এই দুঃসাহসিকতার জন্য তাহাকে সস্নেহ বিগলিতকণ্ঠে তিরস্কার করিয়াছিল। কস্তুরীর ঠোঁট দুইটি বারবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোনো কথা বাহির হয় নাই। শুধু তাহার নিতল চোখ দুটির দৃষ্টিতে যে গভীর অনির্বচনীয় ভাবাবেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই গৌরীকে পুরস্কৃত করিয়াছিল। তারপর কথার ধারা কেমন যেন ক্ষীণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ তাহাদের পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপ্রতিভভাবে সরিয়া গিয়া পাহারা দিবার অছিলায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতনের সঙ্গে কস্তুরী চোখ তুলিয়া চাহিল, দুইজনের চোখাচোখি হইল। দুইটি চোখ মাধুর্যের গাঢ়তায় গম্ভীর— অন্য দুইটি জিজ্ঞাসার ব্যগ্রতায় ব্যাকুল।

গৌরী অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল— কস্তুরী!

কস্তুরী চোখ নামাইয়াছিল, আবার তুলিল।

গৌরী সাগ্রহকণ্ঠে বলিল— কালকের অপরাধ ক্ষমা করেছ?

একটুখানি হাসি— কিম্বা হাসির আভাস–কস্তুরীর ঠোঁটের কোণ দুইটিকে ঈষৎ প্রসারিত করিয়া দিল। কস্তুরী আবার চক্ষু অবনত করিল।

গৌরী আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল— রানি, আমার বুকের মধ্যে যে তুফান বইছে তা যদি দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতে তুমি আমাকে কী করেছ। তোমাকে দেখে আমার আশা মেটে না, আবার বেশীক্ষণ দেখতেও ভয় করে– মনে হয় বুঝি অপরাধ করছি। আমার প্রাণের এই উজ্জ্বল অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যাই, যেখানে রাজ্য নেই, রাজা নেই, রানী নেই— শুধু তুমি আর আমি। শুধু আমাদের ভালবাসা। কস্তুরী, তোমার ইচ্ছে করে না?

কস্তুরীর মাথা আর একটু অবনত হইল, নিশ্বাস পতনের শব্দের মত লঘু অস্ফুটস্বরে সে বলিল— করে।

সহসা হাত বাড়াইয়া কস্তুরীর আঁচলের প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া গৌরী বলিল— কস্তুরী, চল আমরা তাই যাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল! এ কি অসঙ্গত অর্থহীন প্রলাপ সে বকিতেছে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল— আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস কৃষ্ণার চিঠিতে আজ তা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা জানবার জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কস্তুরী–

কস্তুরী প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলিল।

গৌরী আবার আরম্ভ করিতে গিয়া থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে কৃষ্ণা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে; এখন তাহার দিকে চোখ পড়িতেই সে কস্তুরীর আঁচল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু যে প্রশ্নটা তাহার কণ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর জানিবার অধীরতাও তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিল— কৃষ্ণা, তুমি একটিবার বাইরে যাবে? বেশী। নয়— দুমিনিটের জন্য।

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া একটু ভ্রু তুলিল, গৌরীর দিকে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল–আচ্ছা। কিন্তু ঠিক দুমিনিট পরেই আমি আবার ফিরে আসব।

কৃষ্ণা পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গৌরী তখন কস্তুরীর মুখের খুব সন্নিকটে মুখ আনিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—কস্তুরী, একটা কথার উত্তর দেবে কি?

গম্ভীর আয়ত চোখ দুইটি গৌরীর মুখের উপর স্থির হইল— একটু বিস্ময়, একটু কৌতূহল, অনেকখানি ভালবাসা সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল। গৌরী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, কস্তুরীর যে-হাতখানা কোলের উপর পড়িয়াছিল, সেটা দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল; একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল— কস্তুরী, তোমার চোখের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মন আর শাসন মানছে না, মনে হচ্ছে। তবু তুমি একটা কথা বল। আমি যদি শঙ্কর সিং না হতাম, ঝিন্দের রাজা না হতাম, তবু কি তুমি আমায় ভালবাসতে?

কস্তুরীর হাতটি গৌরীর মুঠির মধ্যে একটু নড়িল, গ্রীবা একটু বাঁকিল। একবার মনে হইল বুঝি সে উত্তর দিবে, কিন্তু সে উত্তর দিল না, নিজের কঙ্কণের দিকে চাহিয়া রহিল।

গৌরী তখন আরো ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল কস্তুরী, মনে কর আমি ঝিন্দের শঙ্কর সিং নই, মনে কর আমি একজন সামান্য বিদেশী–কোনো দূর দেশ থেকে এসে হঠাৎ ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু কি তুমি আমায় ভালবাসবে?

কস্তুরী গৌরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার চোখ দুইটি একটু ঝাপসা দেখাইল। অধর যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। তারপর তাহার ধরাধরা অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনা গেল— আমাকে কি পরীক্ষা করছেন?

না না–কস্তুরী। কিন্তু তুমি শুধু বল যে, তুমি আমাকেই ভালবাস, রাজ্যসম্পদ বাদ দিলেও তোমার ভালবাসা লাঘব হবে না।

ক্ষণকাল কস্তুরী নীরব রহিল, তারপর গৌরীর চোখে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল–আপনি যদি একজন সামান্য সিপাহী হতেন, আপনার পরিচয় ঝিন্দঝডোয়ার কেউ না জান্ত, আপনি যদি অখ্যাত বিদেশী হতেন—তবু আপনি আমার–

তোমার?

আমার মালিক।

অকস্মাৎ কস্তুরীর চোখ ছাপাইয়া বুকের কাপড়ের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কস্তুরী! গৌরীর কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে হাত দিয়া কস্তুরীর চিবুক তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে শুরু করিল–তবে শোনো–আমি—

ঠিক এই সময় দ্বারের পর্দা নড়িয়া উঠিল; কৃষ্ণা প্রবেশ করিল।

আর একটু হইলে দুর্নিবার আবেগের মুখে গৌরী সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত, কৃষ্ণার আবির্ভাবে সে থামিয়া গেল। কৃষ্ণা যেন তাহাকে কঠিন বাস্তব জগতে টানিয়া ফিরাইয়া আনিল। সে বাঁ হাতটা একবার চোখের উপর দিয়া চালাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণা আসিয়া হাসিমুখে বলিল— হ্যাঁ, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। রাত দুপুরের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

গৌরীর গলার ভিতর যেন একটা কঠিন পিণ্ড আটকাইয়া গিয়াছিল, সে গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বলিল–কাল সকালেই আমি শক্তিগড় যাচ্ছি—হয়তো আর–

তাহার কথা শেষ না হইতেই কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল—শক্তিগড়?

কস্তুরীর চোখের জল তখনো শুকায় নাই, কিন্তু তাহারই ভিতর হইতে নিমেষের জন্য কৌতুক-মাখানো দৃষ্টি কৃষ্ণার মুখের পানে তুলিল।

গৌরী বলিল— শিকারে যাচ্ছি–কবে ফিরব বলতে পারি না। হয়তো–

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া বলিল— হয়তো সেখানে কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে, যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি–কে জানে?

গৌরী কৃষ্ণার মুখের প্রতি অর্থপূর্ণভাবে তাকাইয়া বলিল— তা পারে। আজ তাহলে চললাম।

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। সতৃষ্ণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া গৌরী বলিল— কস্তুরী, চললাম। হয়তো—

নৃত্যচঞ্চল চোখে কৃষ্ণা বলিল–হয়তো শক্তিগড় থেকে ফেরবার আগেই আবার দেখা হবে। অত কাতরভাবে বিদায় নেবার দরকার নেই।

গৌরী কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কৃষ্ণা বলিল–চলুন, আপনাকে আমার ডিঙিতে করেই আপনার ঘাটে পৌঁছে দিই।

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল— না, তোমাকে আর কষ্ট দেব না। যে ভাবে এসেছি সেই ভাবেই ফিরে যাব।

কস্তুরীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল, সে অতি মৃদুস্বরে বলিল— কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনা–

কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না কস্তুরী– আমি এখন মরব না। যদি মরি তো শক্তিগড়ে গিয়ে— এখানে নয়। বলিয়া গৌরী মাথা নাড়িয়া হাসিল।

কৃষ্ণা বলিল— ও কি কথা! সখীকে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন কেন? চলুন—

চল কৃষ্ণা–

দ্বারের কাছে গৌরী ফিরিয়া দেখিল–কস্তুরী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই শেষ দেখা?

অন্ধকারে ঘাটের পাদমূলে আসিয়া গৌরী কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যাকুলস্বরে বলিল–কৃষ্ণা, হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না, এই শেষ দেখা। যদি আমাদের জীবনে এমন কোনো বিপর্যয় ঘটে যায়, যা এখন তোমাদের কল্পনারও অতীত–তুমি কস্তুরীকে ছেড়ো না। সর্বদা তার কাছে থেকো; তুমি কাছে থাকলে হয়তো সে শান্তি পাবে! বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হায়! মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইত!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিনিয়োগ

পরদিন প্রভাতে শক্তিগড় যাত্রার কথা রাজসংসারে প্রচারিত হইল। চম্পা পূর্বাহ্নে কিছু জানিত না, সংবাদ পাইয়া তাহার ভারি অভিমান হইল। যাত্রার আয়োজন সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, আজই যাওয়া হইবে— অথচ সে কিছু জানে না! মুখ ভার করিয়া সে রাজার মহলের দিকে চলিল।

দ্বারের সম্মুখে রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে দেখিয়া চম্পা ভঙ্গি করিয়া বলিল— রাজা আজ শক্তিগড়ে যাচ্ছেন, তুমি আগে থেকে জানতে?

উদাসভাবে উর্ব্বদিকে তাকাইয়া রুদ্ররূপ বলিল–জানতাম।

তবে আমাকে বলনি কেন?

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া রুদ্ররূপ জবাব দিল–দরকার মনে করিনি।

চম্পা রাগিয়া গিয়া বলিল— দরকার মনে করনি! তোমার কি কোনোদিন বুদ্ধি হবে না? এখন আমি এত কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নেব কি করে বল দেখি!

রুদ্ররূপ বিস্ময়ে ভ্রু তুলিয়া বলিল–তুমি তৈরি হবে কি জন্যে?

অধীরস্বরে চম্পা বলিল— বোকা কোথাকার! রাজার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে না?

রুদ্ররূপ যেন স্তম্ভিতভাবে বলিল— রাজার সঙ্গে তুমি যাবে? সে আবার কি? পথ ছাড়ো। তোমার সঙ্গে আমি বতে পারি না।

রুদ্ররূপ রাজার ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চম্পা, রাজার সঙ্গে তোমার যাওয়া হতে পারে না।

চম্পা অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ রুদ্ররূপের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল— তার মানে? রাজা কি কোনো হুকুম জারি করেছেন?

না। কিন্তু তোমার যাওয়া চলবে না।

কেন চলবে না শুনি?

রাজা যে-কাজে যাচ্ছেন সে কাজে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

বিপদের সম্ভাবনা! রাজা তো বেড়াতে যাচ্ছেন। আর, বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তো আমি যাবই। আমি না গেলে তাঁর পরিচর্যা করবে কে?

চম্পা, জিদ করো না, আমরা বড় ভয়ঙ্কর কাজে যাচ্ছি। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে সব ভেস্তে যাবে। তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

তোমার হুকুম নাকি?

হ্যাঁ, আমার হুকুম।

তোমার হুকুম আমি মানি না। তুমি আমার মালিক নও। বলিয়া চম্পা সগর্বে রুদ্ররূপকে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিল।

চম্পাদেঈ!

চম্পা চমকিয়া মুখ তুলিল। এমন দৃঢ় এত কঠিন স্বর রুদ্ররূপের সে কখনো শুনে নাই। দুইজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে চম্পার চোখ নত হইয়া পড়িল। ঠোট দুইটি ফুলিতে লাগিল, রুদ্ধ লোদনের কণ্ঠে সে বলিল–আমি তাহলে যেতে পাব না?

রুদ্ররূপের কণ্ঠস্বরও কোমল হইল; সে বলিল— না, এবার নয়। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে থাক। আমরা শীঘ্রই ফিরে আসব।

চম্পা হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একমুহূর্তে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কোন্ ইন্দ্রজালে এমন হইল? এতদিন চম্পা রুদ্ররূপকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে—আর আজ–

বশীভূতা চম্পা একবার জল-ভরা চোখ দুইটি রুদ্ররূপের মুখের পানে তুলিল। দর্প তেজ খরশান কথা—আর কিছু নাই! বোধ হয় এতদিনে চম্পা প্রথম নারীত্ব লাভ করিল।

স্খলিত অঞ্চল মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে সে ফিরিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, স্বত্বাধিকারী প্রভুর মত রুদ্ররূপ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

.

সিংগড় হইতে যে প্রাচীন পথ সিধা তীরের মত শক্তিগড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, কিস্তা নদীটি চপলগতি সঙ্গীর মত প্রায় সর্বদাই তার পাশে পাশে চলিয়াছে। কখনো মোড় ফিরিয়া ঈষৎ দূরে চলিয়া গিয়াছে, আবার বাঁকিয়া পথের ঠিক পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরে সেই পথ দিয়া গৌরী তাহার সওয়ারের দল লইয়া চলিয়াছিল। সবসুদ্ধ পঞ্চাশজন সওয়ার আগে পিছে। চলিয়াছে, মধ্যে গৌরী, সর্দার ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ। সওয়ারদের কোমরে তরবারি, হাতে বর্শা। রুদ্ররূপের কোমরে তরবারি আছে; কিন্তু বর্শা নাই। ধনঞ্জয়ের কটিবন্ধে সদারের ভারী পিস্তল। গৌরী প্রায় নিরস্ত্র, তাহার কোমরে কেবল সেই সোনার মুঠযুক্ত ছোরাটি রহিয়াছে, ঝিন্দে আসার প্রাক্কালে শিবশঙ্কর যেটি তাহাকে দিয়াছিলেন। ঘোড়াগুলি মন্থর কদম চালে চলিয়াছে। দ্রুত যাইবার কোনো

প্রয়োজন নাই; এই চালে চলিলে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে শক্তিগড়ে পৌঁছানো যাইবে। একদল ভৃত্য তাম্বু ও অন্যান্য অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি লইয়া সকালেই যাত্রা করিয়াছে; তাহারা বাসস্থানাদি নির্মাণ করিয়া প্রস্তুত থাকিবে।

হেমন্তের মাধ্যন্দিন সূর্য তেমন প্রখর নয়। মাঝে মাঝে পথের পাশে বৃদ্ধ শাখাপত্রবহুল পাহাড়ী বৃক্ষ একটু ছায়ারও ব্যবস্থা করিয়াছে। তাছাড়া কিস্তার জলস্পৃষ্ট বাতাস ভারি মোলায়েম ও স্নিগ্ধ। গৌরী এদিকে একবারও আসে নাই, এতদিন একপ্রকার রাজপ্রাসাদেই অন্তরীণ ছিল। এই মুক্ত দৃশ্যের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল সেইদিনের কথা যেদিন সে প্রথম ঝি স্টেশনে নামিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সিংগড়ের পথ ধরিয়াছিল।

বর্তমান দৃশ্যটা ঠিক তাহার অনুরূপ না হইলেও স্মৃতি-জাগানিয়া বটে! পথ ঋজু, কিন্তু সর্বদা সমতল নয়, সাগরের ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। বামপার্শ্বের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কঙ্করপূর্ণ ও অমসৃণ। এখানে ওখানে দুই-চারিটি কঠিন-প্রাণ পাহাড়ী গাছের গুল্ম। দক্ষিণে বিসর্পিলগতি কিস্তা। সর্বশেষে সমস্ত পার্বত্য দৃশ্যটিকে ঘিরিয়া বলয়াকৃতি নীল পাহাড়ের রেখা।

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া গৌরী কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রস্তরময় পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের সমবেত শব্দ, জিনের চামড়ার মসমস শব্দ, ঘোড়ার মুখে জিঞ্জিরের ঝিনঝিন শব্দ মিলিয়া একটি ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে— সেই ছন্দের তালে তালে গৌরীর মনটাও কোথাও উধাও হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ কোনো চিন্তা মনের মধ্যে থাকে না অথচ

অতি সুক্ষ্ম একটা লুতন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বিচিত্র আকৃতির ভঙ্গুর জাল বুনিতে থাকে— তাহার মানসিক অবস্থাটা সেইরূপ।

সর্দার ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে তাহার দিবাস্বপ্নের জাল ছিড়িয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রুদ্ররূপ কখন পিছাইয়া গিয়াছে— কেবল ধনঞ্জয় তাহার পাশে রহিয়াছেন।

ধনঞ্জয় ভ্রূর উপর করতল রাখিয়া সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন; তারপর মৃদুস্বরে কতকটা আত্মগতভাবে বলিলেন-আজ আমাদের অভিযান দেওয়ান কালীশঙ্করের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ! দেড়শ বছর আগে কে ভেবেছিল যে ঝিন্ রাজ্যের নাট্যশালায় তাঁর বংশধরেরাই একদিন প্রধান অভিনেতা হয়ে দাঁড়াবে? আশ্চর্য!

গৌরী বলিল— এবার তোমার হেঁয়ালি ছেড়ে আসল গল্পটা আগাগোড়া বলতে হবে সর্দার। আমাকে কেবল ভ্যাবাচাকা খাইয়ে চুপ করে যাবে— সে হবে না। নাও, এখন তো তোমার কোনো কাজ নেই, এইবার কালীশঙ্করের কেচ্ছা আরম্ভ কর।

ধনঞ্জয় একটু হাসিলেন; বলিলেন— বলছি। বলবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে; কারণ যেকাজে আমরা চলেছি, তার ফলাফল যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত–

শেষ পর্যন্ত তোমার গল্প শোবার জন্য আমি বেঁচে না থাকতে পারি?

কিম্বা গল্প বলবার জন্য আমি বেঁচে না থাকতে পারি। সবই সম্ভব। হয়তো আমরা দুজনেই বেঁচে থাকব, অথচ এ গল্প আর বলা চলবে না। তার চেয়ে এই বেলা সেরে রাখা ভাল।

গৌরী একটু ভাবিয়া বলিল— আমি এ গল্প শুনলে যদি কারুর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে বলবার দরকার কি?

ধনঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন–আপনার পূর্বপুরুষ কালীশঙ্কর সম্বন্ধে একটা রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি; এমন কাজে আপনাকে ব্রতী করেছি যাতে জীবননাশের সম্ভাবনা। সুতরাং আমার কাছে আপনার একটা কৈফিয়ৎ প্রাপ্য। সে কৈফিয়ৎ যদি আমি না দিই, আপনি ভাবতে পারেন যে আমি আপনাকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছি।

বেশ, তাহলে বল।

আমি যে গল্প বলব তাতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হবে যে আপনি এ পর্যন্ত অধিকারবহির্ভূত কোনো কাজ করেননি এবং শেষ পর্যন্ত যদি–

ওকথা অনেকবারই শুনেছি। এবার গল্প আরম্ভ কর।

ধনঞ্জয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। গতিশীল সওয়ার দলের অশ্বক্ষুরধ্বনির ভিতর হইতে তাঁহার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর গৌরীর কানে আসিতে লাগিল। সে সম্মুখ দিকে তাকাইয়া শুনিতে লাগিল।

গল্প আরম্ভ করবার আগে এ কাহিনী আমি কি করে জানতে পারলাম তা বলা দরকার। রাজপরিবারের এই গুঢ় কাহিনী জনসাধারণের জানবার কথা নয়; বোধ হয় বর্তমানে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু দেওয়ান বজ্রপাণি জানেন, তাঁকে আমি বলেছি।

জাতিতে বৈশ্য হলেও আমরা পুরুষানুক্রমে রাজার পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী— একথা বোধ হয় আগে শুনেছেন। দেড়শ বছর আগে আমার উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এই পদ প্রথম পেয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল শেঠ চন্দ্রকান্ত। তিনি কি করে তদানীন্তন মহারাজ ধূর্জটি সিংহের অনুগ্রহভাজন হয়ে ক্রমে তাঁর বন্ধু ও পার্শ্বচর হয়ে উঠেছিলেন সে কাহিনী এখানে অবান্তর। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি। ধূর্জটি সিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

কিন্তু রাজার পার্শ্বচর হয়েও চন্দ্রকান্ত বেনিয়া স্বভাব ছাড়তে পারেননি। সে সময় বেনিয়া ছাড়া অন্য জাতের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না; হিসাব-কিতাব লেখার জন্য বেনিয়াদের লেখাপড়া শিখতে হত। চন্দ্রকান্ত হিসাব তো লিখতেনই, তার ওপর আর একটা জিনিস লিখতেন যা আজকের দিনে অমূল্য বলে পরিগণিত হতে পারে। সেটি হচ্ছে তদানীন্তন রাজ-দরবারের দৈনন্দিন রোজ-নার্চা। রাজ-সংসারের খুঁটিনাটি, রাজ-

অন্তঃপুরের জনশ্রুতি, দরবারের কেচ্ছা—সবই তাঁর গোপন দপ্তরে স্থান পেত। জীবনের শেষ পনের কুড়ি বছর তিনি নিয়মিত এই কার্যটি করেছিলেন।

যাহোক, চন্দ্রকান্ত একদিন বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করলেন। তাঁর দপ্তর অন্যান্য হিসাবের খাতার সঙ্গে রক্ষা করা হল। চন্দ্রকান্তের পর থেকে আমাদের বংশে লেখাপড়ার চর্চা কমে গিয়েছিল। যাদের রাজার পাশে থেকে অস্ত্র চালাতে হবে তাদের আবার বিদ্যাশিক্ষার দরকার কি? কাজেই গত চার পুরুষের মধ্যে চন্দ্রকান্তের দপ্তর কেউ খুলে পড়লে না।

আমিই প্রথম এই দপ্তর উদ্ধার করি। তখন আমার বয়েস কম, কৌতূহল বেশী– চন্দ্রকান্তের রোজ-নার্চা পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে মনে হল একটা উপন্যাস পড়ছি। সেই দপ্তরে দেওয়ান কালীশঙ্করের ইতিহাস পড়ি। পনের বছরের ইতিহাসের ভিতর থেকে কালীশঙ্করের জীবনকাহিনী জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে। মনে হয়, চন্দ্রকান্ত যে কাহিনী লিখে গেছেন তার প্রধান নায়কই যেন কালীশঙ্কর।

আর একটা জিনিস সেই দপ্তরের সঙ্গে পেয়েছিলাম। আপনি জানেন, হাতির দাঁতের ফলকের উপর ছবি আঁকার জন্য ঝি চিরদিন বিখ্যাত। এখন প্রতিকৃতি আঁকার শিল্প লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু সে সময় মোগল যুগের শেষ দিকে এই শিল্পের খুব প্রচার ছিল। চন্দ্রকান্তের দপ্তরের সঙ্গে একতাড়া ছবি আঁকার ফলকও পেয়েছিলাম। ফলকের পিছনে চিত্রার্পিত ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। সে সময়ের অনেক বড় বড় লোকের ছবি ছিল। রাজা ধূর্জটি সিংয়ের ছবি ছিল। কালীশঙ্করের ছবিও ছিল।

তাই, কালীশঙ্করের চেহারা আমার জানা ছিল এবং সেইজন্যই আপনাদের বাড়িতে তাঁর তৈলচিত্র দেখেই আমি বুঝতে পারি যে এ কালীশঙ্কর ছাড়া আর কেউ নয়। সেই তীক্ষ্ণ চোখ, সেই খড়ের মত নাক একবার যে দেখেছে সে কখনো ভুলবে না।

এতক্ষণে আমার কৈফিয়ৎ শেষ হল। এবার গল্পটা শুনুন। গল্পটা রোজ-নাচার দেড় হাজার পাতার মধ্যে ছড়ানো আছে; আমি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে বলছি।

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বোধ করি গল্পটা মনে মনে গুছাইয়া লইলেন; তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

দপ্তরের দ্বিতীয় বছরে কালীশঙ্করের নাম প্রথম পাওয়া যায়। প্রথমে দেখি, রাজসভায় একজন বাঙালী লড়াক এসেছে; রাজাকে অনেক রকম অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। তারপর দেখি কালীশঙ্কর রাজ-ভ্রাতাদের অস্ত্রগুরু নিযুক্ত হয়েছেন। রাজা তখন বয়সে তরুণ, বংশধর জন্মগ্রহণ করেনি।

ক্রমে তিন মাস যেতে না যেতেই দেখতে পাই কালীশঙ্কর রাজসভার প্রধান ওমরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি শিকারে, কি মন্ত্রণায়, কি বিলাস-ব্যসনে কালীশঙ্কর না হলে রাজার একদণ্ডও চলে না।

কালীশঙ্করকে চন্দ্রকান্ত প্রথমে একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও কালীশঙ্করের সম্মোহন শক্তিতে বশীভূত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বৎসরের শেষাশেষি দেখি, চন্দ্রকান্ত তাঁর দপ্তরে ভাই কালীশঙ্কর লিখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা দুজনে যেমন রাজার ডান হাত বাঁ হাত, তেমনি পরস্পর প্রাণপ্রতিম বন্ধু হয়ে উঠেছেন–কেউ কারুর কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করেন না।

চতুর্থ বর্ষে রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী মারা গেলেন। এইবার কালীশঙ্করের চরম উন্নতি হল—রাজা তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর রাজ্যের কর্ণধার হয়ে উঠলেন! একজন বিদেশীর এই উন্নতিতে অনেকের চোখ টাটালো বটে কিন্তু কার্যদক্ষতায় কূটবুদ্ধিতে রায় দেওয়ানের সমকক্ষ কেউ ছিল না তাই কেউ উচ্চবাচ্য করতে পারল না। চন্দ্রকান্ত অবশ্য খুব খুশি হলেন। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে একজন অন্য জনের পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করতেন না।

তারপর আরো দুবছর কেটে গেল। এই সময়ে কালীশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি— ঝিন্দের সঙ্গে ইংরাজ-সরকারের মিত্রতা-মূলক সন্ধি। তিনি এমন সুকৌশলে রাজার মর্যাদা রেখে এই কাজ সুসম্পন্ন করলেন যে, রাজা রাজ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত শাসন পালনের ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে। নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন যাপন করতে লাগলেন। এইভাবে রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চলতে লাগল, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। কেবল একটি বিষয়ে রাজা এবং প্রজারা একটু নিরানন্দ—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজার বংশধর জন্মগ্রহণ করল না। রাজার তিন রানী–তিনজনেই নিঃসন্তান।

রাজা হোম যজ্ঞ দৈবকার্য অনেক করলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না। হতাশ হয়ে রাজা শেষে মহাপণ্ডিত রাজগুরুর শরণাপন্ন হলেন। রাজগুরু অনেক চিন্তার পর বললেন— একটিমাত্র উপায় আছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় থামিলেন।

গৌরী সাগ্রহে বলিল— তারপর–?

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন–প্রাচীনকালে নিয়োগ-প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল জানেন?

স্তম্ভিত হইয়া গৌরী বলিল— জানি–

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন— ঝিন্দে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি নেই, কিন্তু অবস্থা বিশেষে নিয়োগ-প্রথা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। রাজবংশেই প্রায় দুশ বছর আগে ঐ রকম ব্যাপার করতে হয়েছিল। গুরু নজির দেখিয়ে রাজাকে সেই পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন।

ব্যাপারটা বোধ হয় এবার বুঝতে পেরেছেন?

অস্ফুট স্বরে গৌরী বলিল— কালীশঙ্কর–?

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িলেন–প্রকাশ্যে এক মহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে-যজ্ঞ টিকা পরলেন রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর। রাজা, রাজগুরু আর স্বয়ং কালীশঙ্কর ছাড়া একথা আর কেউ জানল না। এমন কি রানী পর্যন্ত না। সেকালে অনেক রকম ওষুধ ছিল—

যাহোক, যথাসময় পাটরানী পদ্মা দেবী এক কুমার প্রসব করলেন। রাজ্যে মহা সমারোহ পড়ে গেল; দেশ দেশান্তর থেকে অভিনন্দন এল। রাজা ধূর্জটি সিং কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে পারলেন না; তিনি রাজপ্রাসাদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন।

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, রাজার মুখ ততই অন্ধকার হতে লাগল। একটা অসূয়ামিশ্রিত অবসাদের ভাব তাঁর প্রসন্ন চিত্তকে গ্রাস করে নিলে। সর্বদাই ভ্রূকুটি করে থাকেন; সভায় হাসি মস্করার প্রসঙ্গ উঠলে ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।

রাজকুমারের বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু রাজা কুমারকে স্পর্শ করেন না— ঘৃণাভরে তাকে নিজের সুমুখ থেকে সরিয়ে দেন। ওদিকে কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এমন হয়ে দাঁড়াল যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। আগে মুহূর্তের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, এখন কেবল রাজকার্য ব্যপদেশে দেখা হয়। যে দু-চারটে কথা হয় তাও রাজকীয় ব্যাপার সংক্রান্ত। বয়স্যের সম্পর্ক ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। রাজকুমার হরগৌরী সিং বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। কুমারের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে রাজসভায় কানাঘুষা আরম্ভ হল। কুমার যতই বড় হচ্ছেন, কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সকলেই তা লক্ষ্য করলে। আড়ালে ইশারা ইঙ্গিত চোখ ঠারাঠারি চলতে লাগল।

রাজা তখন মদ ধরেছেন, অষ্টপ্রহর মদে ডুবে থাকেন। সভায় যখন আসেন তখন চারিদিকে কিছুই লক্ষ্য করেন না; সভাসা নানাভাবে তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে, তিনি তাদের কথা শুনতে পান না; ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে বসে থাকেন।

আরো কয়েক বছর কেটে গেল। রাজা থেকেও নেই, তাই সভাসদদের স্পর্ধা ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল। কুমারের যখন আট বছর বয়স তখন এক কাণ্ড হল। একজন নির্বোধ ওমরা রাজার সুমুখেই কুমারের চেহারা নিয়ে একটা বাঁকা ইঙ্গিত করলে, বললে—কুমারের চেহারা যেমন দেওয়ান কালীশঙ্করের মত, আশা করা যায়, বুদ্ধিতেও তিনি তেমনই প্রখর হবেন। রাজা অন্য সময় কিছুই শুনতে পান না, কিন্তু এ কথাগুলো তাঁর কানে গেল; এতদিনের রুদ্ধ গ্লানি অগ্ন্যুৎপাতের মত বেরিয়ে এল। তিনি সিংহাসন থেকে লাফিয়ে গিয়ে সেই ওমরার চুলের মুঠি ধরলেন, তারপর তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে নিলেন।

হুলস্থুল কাণ্ড! এই সময় কালীশঙ্কর দ্রুতপদে বাইরে থেকে এসে রাজার হাত ধরে বললেন— মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।

রাজা ধূর্জটি সিং কষায়িত চোখ কালীশঙ্করের দিকে ফেরালেন; তাঁর মুখ দেখে মনে হল, কালীশঙ্করকেও বুঝি তিনি হত্যা করবেন। কিন্তু কালীশঙ্করের চোখের দৃষ্টিতে কি সম্মোহন শক্তি ছিল জানি না, রাজা তাঁর গায়ে অস্ত্র তুলতে পারলেন না। শুধু রক্তে রাঙা তলোয়ারখানা দ্বারের দিকে দেখিয়ে বললেন— যাও।

কালীশঙ্কর সভা থেকে ফিরে এলেন। সেই রাত্রে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গোপনে তাঁর মন্ত্রণা হল। কালীশঙ্কর কুশাগ্রধী লোক ছিলেন, অনেক আগে থেকেই তিনি এই দুর্যোগের দিন প্রতীক্ষা। করছিলেন তাই নিজের আজীবন সঞ্চিত টাকাকড়ি সব রাজ্যের বাইরে সরিয়ে ফেলেছিলেন। চন্দ্রকান্ত বললেন, কালীশঙ্করের পক্ষে আর এ রাজ্যে থাকা নিরাপদ নয়; রাজা নিজে তাঁকে হত্যা করতে পারেননি বটে, কিন্তু হত্যা করবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত হয়েছে— এ খবর তিনি পেয়েছেন। দুই বন্ধু সেই রাত্রে শেষ আলিঙ্গন করে নিলেন।

পরদিন কালীশঙ্কর নিরুদ্দেশ হলেন। পনের বছর পরে ঝিন্দের রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের উপর। যবনিকা পড়ে গেল।

এর পরের যা ইতিহাস, তা আপনার বংশের ইতিহাস। আমার চেয়ে আপনিই তা বেশী জানেন?

ধনঞ্জয় নীরব হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি একবার গৌরীর কোমরের ছোরাটার উপর গিয়া পড়িল।

একাগ্রভাবে শুনিতে শুনিতে গৌরীর চিবুক বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছিল। সে এইবার মুখ তুলিল; তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলিয়া গেল। সম্মুখে প্রায় দুই মাইল দূরে তখন শক্তিগড়ের পাষাণ চূড়া দেখা দিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া সে যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল— অর্থাৎ শঙ্কর সিং, উদিত আর আমি–আমরা সকলেই কালীশঙ্করের বংশধর, জ্ঞাতি ভাই। চমৎকার!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিগড়

কিস্তা নদী যেখানে দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিম্নের উপত্যকায় ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে কিস্তার উত্তর তীরে শক্তিগড় দুর্গ অবস্থিত। কিস্তার তীরে বলিলে ঠিক বলা হয় না; বস্তুত দুর্গটি উত্তরটলগ্ন জলের ভিতর হইতেই মাথা তুলিয়াছে। এই স্থানে কিস্তা অসমতল প্রস্তরবন্ধুর খাতের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, জলের ভিতর হইতে বড় বড় পাথরের চাপ মাথা জাগাইয়া আছে। এইরূপ কতকগুলি অর্ধনগ্ন প্রস্তরশীর্ষের ভিত্তির উপর উত্তর তীর ঘেঁষিয়া শক্তিগড় দুর্গ নির্মিত।

জলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শক্তিগড়ের চারিপাশে পরিখা খননের প্রয়োজন হয় নাই; কিস্তার প্রস্তরবিক্ষুব্ধ ফেনায়িত জলরাশি তাহাকে বেষ্টন করিয়া সগর্জনে বহিয়া গিয়াছে। একটি সঙ্কীর্ণ সেতু খরস্রোতা প্রণালীর উপর দিয়া তীরের সহিত শক্তিগড় দুর্গের সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাই দুর্গপ্রবেশের একমাত্র পথ।

শক্তিগড় দুর্গটি আয়তনে ছোট। দুর্গের আকারে নির্মিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচীর পরিখাবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। নিরুপদ্রব ভোগবিলাসের জন্যই বোধ করি অতীতকালের কোনো বিলাসী। রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্গটি এমনভাবে তৈয়ারি যে, মাত্র পাঁচ-ছয় জন বিশ্বাসী লোক লইয়া দুর্গের লৌহদ্বার ভিতর হইতে রোধ

করিয়া দিলে অগণিত শত্রু দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইহা দখল করিতে পারিবে না। কিস্তার গর্ভ হইতে কালো পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাকার উঠিয়াছে; মাঝে মাঝে স্থূল স্তম্ভাকৃতি বুরুজ। প্রাকারগাত্রে স্থানে স্থানে পর্যবেক্ষণের জন্য সঙ্কীর্ণ ছিদ্র। বাহির হইতে দেখিলে দুর্গটিকে একটি নিরেট পাথরের সুবর্তুল তৃপ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গদ্বারের সম্মুখে প্রায় দেড়শত গজ দূরে ফাঁকা মাঠের উপর গৌরীর তাম্বু পড়িয়াছিল। মধ্যস্থলে গৌরীর জন্য একটি বড় শিবির; তাহার চারিপাশে সহচরদিগের জন্য কয়েকখানা ছোট তাম্বু। সবগুলি তাম্বু ঘিরিয়া কাঁটাতারের বেড়া। ধনঞ্জয় কোনো দিকেই সাবধানতার লাঘব করেন নাই। এইখানে হেমন্ত অপরাহের সোনালী আলোয় গৌরী সদলবলে আসিয়া উপনীত হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে এতদূর আসিয়া গৌরী ঈষৎ ক্লান্ত হইয়াছিল; ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস অনেক দিন গিয়াছে। তাই নিজের তাম্বুতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ও কিছু জলযোগ করিয়া সে নিজেকে চাঙ্গা করিয়া লইল। ধনঞ্জয়ের দেহে ক্লান্তি নাই, তিনি আসিয়া বলিলেন– উদিতের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় ঘাবড়ে গেছে। আমরা যে আসতে পারি, তা বেচারা বোধ হয় প্রত্যাশাই করেনি। চলুন কিস্তার ধারে একটু বেড়াবেন; জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই।

দুইজনে বাহির হইলেন; রুদ্ররূপ তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। কাঁটাবেড়ার ব্যহমুখে বন্দুক-কিরিচ-ধারী শাস্ত্রীর পাহারা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনজনে দুর্গদ্বারের দিকে চলিলেন।

দুর্গের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই; প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে কিস্তার তটে ঘন-নিবিষ্ট খড়ের চাল একটি গ্রামের নির্দেশ করিতেছে। গ্রামের ঘাটে জেলেডিঙির মত কয়েকটি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন— ঐ শক্তিগড় গ্রাম— ওটা উদিতের জমিদারী। ওখানকার প্রজারা সব উদিতের গোঁড়া ভক্ত।

গৌরী বলিল— কাছাকাছি কোথাও শস্যক্ষেত্র দেখছি না; এই সব প্রজাদের জীবিকা কি?

প্রধানত মাছ ধরাই ওদের ব্যবসা। এ অঞ্চলে জা কি জোয়ার পর্যন্ত জন্মায় না। তা ছাড়া কুটিরশিল্প আছে— ওরা খুব ভাল জহুরীর কাজ করতে পারে।

গৌরী দুর্গের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল দুর্গের সিংদরজা তো বন্ধ দেখছি; কোথাও জনমানবের চিহ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যাপার কি? কেউ নেই নাকি?

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন— আছে বৈকি! তবে বেশী লোক নেই, গুটি পাঁচ-ছয় বিশ্বাসী অনুচর আছে। কিন্তু আপনি অত কাছে যাবেন না। প্রাকারের গায়ে সরু সরু ফুটো দেখতে পাচ্ছেন? ওর ভেতর থেকে হঠাৎ বন্দুকের গুলি বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়— পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল।

দুর্গের এলাকা সাবধানে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে খানিকদুর গিয়া তাঁহারা কিস্তার পাড়ে দাঁড়াইলেন। কিস্তার জলে অস্তমান সূর্যের রাঙা ছোপ লাগিয়েছে; শক্তিগড়ের

নিকষকৃষ্ণ দেহেও যেন কুঙ্কুমপ্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে। গৌরীর মনে পড়িল প্রহ্লাদের চিঠির কথা। এই দিকেই প্রাকার গাত্রে কোথাও একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে–সেই গবাক্ষ চিহ্নিত কক্ষে শঙ্কর সিং অবরুদ্ধ। গৌরী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল এদিকে জল হইতে তিন-চার হাত উপরে কয়েকটি চতুষ্কোণ জানালা রহিয়াছে; তাহার মধ্যে কোনটি শঙ্কর সিং-এর জানালা, তাহা অনুমান করা শক্ত। জানালাগুলির নিম্নে ক্ষুব্ধ জলরাশি আবর্তিত হইয়া বহিয়া গিয়াছে নিম্নে নিমজ্জিত পাথর আছে। সাঁতার কাটিয়া বা নৌকার সাহায্যে জানালার নিকটবর্তী হওয়া কঠিন।

দুর্গের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া গৌরী কিস্তার অপর পারে তাকাইল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই; নদীর অপর পারে দুর্গের প্রায় সমান্তরালে একটি বেশ বড় বাগানবাড়ি রহিয়াছে। কিস্তা এখানে প্রায় তিনশত গজ চওড়া, তাই পরপার পরিষ্কার দেখা যায় না; তবু একটি উপবন-বেষ্টিত প্রাসাদ সহজেই চোখে পড়ে। বাগানের প্রান্তে একটি বাঁধানো ঘাটও কিস্তার জলে ধাপে ধাপে অবগাহন করিতেছে। এই বাগান ও বাড়িতে বহুলোকের চলাচল দেখিয়া মনে হয়, যেন ওই বিজনপ্রান্তে কোনও উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

গৌরী বলিল—একটা বাগানবাড়ি দেখছি। ওটাও কি উদিতের নাকি?

ধনঞ্জয় বলিলেন— না। নদীর ওপারে উদিতের সম্পত্তি কি করে হবে— ওটা ঝড়োয়া রাজ্যের অন্তর্গত। বাগানবাড়িটা ঝড়োয়ার বিখ্যাত সর্দার অধিক্রম সিংয়ের সম্পত্তি; ওদিকটা সবই প্রায় তার জমিদারী। তারপর চোখের উপর করতল রাখিয়া কিছুক্ষণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—কিন্তু অধিক্রমের বাগানবাড়িতে এত লোক কিসের?

অধিক্রম মাঝে মাঝে তার জমিদারীতে এসে থাকে বটে, কিন্তু এ যেন মনে হচ্ছে কোনও উৎসব উপলক্ষে বাগানবাড়ি সাজানো হচ্ছে! কি জানি, হয়তো তার মেয়ের বিয়ে।

রুদ্ররূপ পিছন হইতে সসম্ভ্রমে বলিল— আজ্ঞে হাঁ, অধিক্রম সিংয়ের মেয়ে কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে হাবিলদার বিজয়লালের বিয়ে।

গৌরী সচকিত হইয়া বলিল— তাই নাকি! তুমি কোথা থেকে শুনলে?

রুদ্ররূপ বলিল— শহরে অনেকেই বলাবলি করছিল। শুনেছি, ঝড়োয়র রানী নাকি স্বয়ং এ বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন। কৃষ্ণাবাঈ রানীর সখী কিনা।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—কবে বিয়ে?

তা বলতে পারি না। বোধ হয় পরশু।

সে রাত্রে কৃষ্ণা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইতে পারে, গৌরী এতক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল। বাপের জমিদারী হইতে কৃষ্ণার বিবাহ হইবে; রানীও আসিবেন। সুতরাং এত কাছে থাকিয়া দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোনো বিঘ্ন নাই। অধিক্রম সিং কন্যার বিবাহে হয়তো রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারেন।

গৌরীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে একদৃষ্টে ঐ উদ্যানবেষ্টিত বাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময় দূরে দুর্গদ্বারে ঝনৎকার শুনিয়া তিনজনেই সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দুইজন অশ্বারোহী আগে পিছে সঙ্কীর্ণ সেতুর উপর দিয়া বাহিরে আসিতেছে। দূর হইতে অপরাহের আলোকে তাহাদের চেহারা ভাল দেখা গেল না। ধনঞ্জয় শ্যেনদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন— উদিত আর ময়ূরবাহন। তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; তিনি একবার কাঁটা-তার বেষ্টিত তাম্বুর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু এখন আর ফিরিবার সময় নাই; উদিত তাঁহাদের দেখিতে পাইয়াছে এবং এই দিকেই আসিতেছে। তিনি গৌরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন–ওরা আপনার কাছেই আসছে, সম্ভবত দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ করবে। রাজী হবেন না। আর সতর্ক থাকবেন প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করবে না বোধ হয়—তবু। রুদ্ররূপ, তোমার পিস্তল আছে?

আছে।

বেশ। তৈরি থাকো। বিশেষভাবে ময়ূরবাহনটার দিকে লক্ষ্য রেখো। বলিয়া তিনি গৌরীর পাশ হইতে কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্ররূপও পিছু হটিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। দুইজনে এমনভাবে দাঁড়াইলেন যাহাতে উদিত ও ময়ূরবাহন আসিয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাঁহারা দুইপাশে থাকিয়া তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারেন।

উদিত ও ময়ূরবাহন ঘোড়া ছুটাইয়া গৌরীর দুই গজের মধ্যে আসিয়া ঘোড়া থামাইল; তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অবনতশিরে গৌরীকে অভিবাদন করিল। ধনঞ্জয় তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন–ভক্তি কিছু বেশী দেখছি।

বাহ্য ব্যবহারে সম্ভ্রম প্রকাশ পাইলেও উদিতের মুখের ভাবে কিন্তু বিশেষ প্রসন্নতা লক্ষ্যগোচর হইল না; সে যেন নিতান্ত গরজের খাতিরেই বাধ্য হইয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইতেছে। বস্তুত তাহার চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রোহপূর্ণ অসহিষ্ণুতার আগুন চাপা রহিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। ময়ূরবাহনের মুখের ভাব কিন্তু অতি প্রসন্ন, তাহার কিংশুকফুল্ল অধরে যে হাসিটি ক্রীড়া করিতেছে তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ ঈষৎ অনুতপ্ত পিরবশ্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সে যেন পূর্ব্বদিনের ধৃষ্টতার জন্য লজ্জিত।

উদিত প্রথম কথা কহিল। একবার গলা ঝাড়িয়া লইয়া পাখিপড়ার মত বলিল— মহারাজ স্বাগত। মহারাজকে সানুচর আমার দুর্গমধ্যে আহ্বান করতে পারলাম না সে জন্য দুঃখিত। দুর্গে স্থানাভাব। তবে যদি মহারাজ একাকী বা দু-একজন ভৃত্য নিয়ে দুর্গে অবস্থান করতে সম্মত হন, তাহলে আমি সম্মানিত হব।

গৌরী মাথা নাড়িল, নিরুৎসুক স্বরে বলিল— উদিত, তোমাকে সম্মানিত করতে পারলাম না। নর্গের বাইরে আমি বেশ আছি। ফাঁকা জায়গায় থাকাই স্বাস্থ্যকর, বিশেষত যখন শিকার করতে বেরিয়েছি।

উদিত বলিল— মহারাজ কি সন্দেহ করেন দুর্গের ভিতরে থাকা তাঁর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর? তাহার কথার খোঁচাটা চোখের অনাবৃত বিদ্রূপে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গৌরী উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই ময়ূরবাহন হাসিতে হাসিতে বলিল– অস্বাস্থ্যকর বৈকি! মহারাজ, আপনি দুর্গে থাকতে অস্বীকার করে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। দুর্গে একজন লোক সংক্রামক রোগে ভুগছে। আপনার বাইরে থাকাই সমীচীন।

গৌরী তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-সংক্রামক রোগটা কি?

ময়ূরবাহন তাচ্ছিল্যভরে বলিল—বসন্ত। লোকটা বোধ হয় বাঁচবে না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—লোকটা কে?

এবার উদিত উত্তর দিল; প্রত্যেকটা শব্দ দাঁতে ঘষিয়া ধীরে ধীরে বলিল—একটা বাঙালী—চেহারা অনেকটা আপনারই মত। লোকটা আমার এলাকায় এসে রাজদ্রোহিতা প্রচার করছিল, তাই তাকে বন্দী করে রেখেছি।

সংযতস্বরে গৌরী বলিল-বটে। কিন্তু তুমি তাকে বন্দী করে রেখেছ কোন্ অধিকারে?

ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রু তুলিয়া উদিত বলিল— আমার সীমানার মধ্যে আমার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে কথা কি মহারাজ জানেন না?

গৌরী পলকে নিজেকে সামলাইয়া লইল, অবজ্ঞাভরে বলিল— শুনেছি বটে। কিন্তু সে-লোকটা ব রাজদ্রোহ প্রচার করে থাকে তাহলে তাকে রাজ-সকাশে পাঠানোই উচিত ছিল, তার অপরাধের বিচার আমি করব। উদিত, তুমি অবিলম্বে এই বিদ্রোহীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

উদিত অধর দংশন করিল। কুটিল বাক্য হানাহানিতে সে পটু নয়; তাই নিজের কথার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ক্রুদ্ধ-চোখে চাহিয়া কি একটা রূঢ় উত্তর দিতে যাইতেছিল ময়ূরবাহন মাঝে পড়িয়া তাহা নিবারণ করিল। প্রফুল্লস্বরে বলিল—মহারাজ ন্যায্য কথাই বলেছেন। কুমার উদিতেরও তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকটা হঠাৎ রোগে পড়ায় আর তা সম্ভব হয়নি। তার অবস্থা ভাল নয়, হয়তো আজ রাত্রেই মরে যাবে। এ রকম অবস্থাতে তাকে মহারাজের কাছে পাঠানো নিতান্ত নৃশংসতা হবে। তবে যদি সে বেঁচে যায়, তাহলে কুমার উদিত নিশ্চয় তাকে বিচারের জন্য মহারাজের হুজুরে হাজির করবেন। কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা তার খুবই কম।

গৌরী আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল–লোকটা যদি মারা যায়। তাহলে কিন্তু বড় অন্যায় হবে। মৃত্যু বড় সংক্রামক রোগ, দুর্গের অন্য অধিবাসীদেরও আক্রমণ। করতে পারে।

অকৃত্রিম হাসিতে ময়ূরবাহনের মুখ ভরিয়া গেল। এই নিগুঢ় বাকযুদ্ধ সে পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছিল, এখন সপ্রশংস নেত্রে গৌরীর মুখের পানে চাহিল। উদিত কিন্তু আর। অসহিষ্ণুতা দমন করিতে পারিল না, ঈষৎ কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল–ওকথা থাক। মহারাজকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করলাম— তিনি যদি সম্মত না হন, তাঁবুতে থাকাই বেশী স্বাস্থ্যকর মনে করেন, সে তাঁর অভিরুচি! বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল।

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল— শিকারের কথাটা–

উদিত ফিরিয়া বলিল— হাঁ–। মৃগয়ার সব আয়োজন করেছি। আমার জঙ্গলে বরাহ হরিণ পাওয়া যায় জানেন বোধ হয়। যদি ইচ্ছা করেন, কাল সকালেই শিকারে বেরোনো যেতে পারে।

গৌরী বলিল-বেশ, কাল সকালেই বেরোনো যাবে।

উদিত লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল, তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অবজ্ঞাভরে একটা নমস্তে বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ময়ূরবাহন তখনও ঘোড়ায় চড়ে নাই। উদিত দূরে চলিয়া গেলে ময়ূরবাহন রেকাবে পা দিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল–আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে। কথাগুলি সে এত। নিম্নকণ্ঠে বলিল যে অদূরস্থ ধনঞ্জয়ও তাহা শুনিতে পাইলেন না।

গৌরী সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

ময়ূরবাহন পূর্ববৎ বলিল— এখন নয়। আজ রাত্রে আমি আসব। এগারোটার সময় এইখানে আসবেন, তখন কথা হবে। নমস্তে! বলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িল; তারপর তাহার শাহত ঘোড়া দ্রুতবেগে উদিতের

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির ঘটনা

ছাউনির দিকে ফিরিতে ফিরিতে গৌরী ধনঞ্জয়কে ময়ূরবাহনের কথা বলিল। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন— আবার একটা কিছু নূতন শয়তানি আঁটছে।

তা তো বটেই। কিন্তু এখন কর্তব্য কি?

দীর্ঘকাল আলোচনা ও পরামর্শের পর স্থির হইল যে ময়ূরবাহনের সহিত দেখা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহার অভিপ্রায় যদিও এখনও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না, তবু অনুমান হয় যে সে উদিতের সহিত বেইমানি করিবার মতলব আঁটিয়াছে। ইহাতে রাজাকে উদ্ধার করিবার পন্থা সুগম হইতে পারে। গৌরী যদিও ময়ূরবাহনের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেই অনিচ্ছুক ছিল, তথাপি নিজেদের মূল উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ দমন করিয়া রাখিল।

কর্তব্য স্থির করিয়া ধনঞ্জয় অন্য প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন গুপ্তচর দুর্গের সেতু-মুখে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন— যাহাতে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে কিনা পূর্বাহ্নে জানিতে পারা যায়। এমন হইতে পারে যে কুচক্রী উদিত গৌরীকে হঠাৎ লোপাট করিয়া দুর্গে লইয়া যাইবার এই নুতন ফন্দী বাহির করিয়াছে। উদিত ও ময়ূরবাহনের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।

রাত্রি এগারোটার সময় চর আসিয়া খবর দিল যে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে। তখন গৌরী, রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাম্বু হইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্রের সম্মিলিত আলো এই। অন্ধকারকে ঈষৎ তরল করিয়াছে মাত্র।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া তিনজনে দাঁড়াইলেন। অদূরে কিস্তা কলধ্বনি করিতেছে, দুর্গের কৃষ্ণ অবয়ব একচাপ কঠিন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের মত আকাশের একটা দিক আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের পাদমূলে কেবল আলোকের একটা বিন্দু দেখা যাইতেছে, হয়তো উহাই শঙ্কর সিংয়ের গবাক্ষ!

কিয়ৎকাল পরে সতর্ক পদধ্বনি শুনা গেল। পদধ্বনি তিন-চার গজের মধ্যে আসিয়া থামিল, তারপর হঠাৎ বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বলিয়া উঠিয়া প্রতীক্ষমান তিনজনের মুখে পড়িল।

ময়ূরবাহন বলিয়া উঠিল—একি! আমি কেবল রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

গৌরী ও রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া রহিল, ধনঞ্জয় ময়ূরবাহনের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণ করতলে পিস্তলটা আলোকসম্পাতে ঝম করিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন–তা বটে। কিন্তু তোমার যা বলবার আছে আমাদের তিনজনের সামনেই বলতে হবে।

তাহলে আদাব, আমি ফিরে চললাম। বলিয়া ময়ূরবাহন ফিরিল।

ধনঞ্জয়ের বাম হস্ত তাহার কাঁধের উপর পড়িল—অত সহজে ফেরা যায় না ময়ূরবাহন।

ময়ূরবাহন ভ্রূকুটি করিয়া ধনঞ্জয়ের হস্তস্থিত পিস্তলটার দিকে তাকাইল, অধর দংশন করিয়া কহিল তোমরা আমাকে আটক করতে চাও?

আপাতত তুমি যা বলতে এসেছ তা বলা শেষ হলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।

তোমাদের সামনে আমি কোনো কথা বলব না। ময়ূরবাহন বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহলে আটক থাকতে হবে।

বেশ। কিন্তু আমাকে আটক করে তোমাদের লাভ কি?

লাভ যে কিছু নাই তাহা ধনঞ্জয়ও বুঝিতেছিলেন। তিনি ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন–তুমি রাজার সঙ্গে এই মাঠের মাঝখানে একলা কথা বলতে চাও। তোমার যে কোনো কু-অভিপ্রায় নেই আমরা বুঝব কি করে?

এবার ময়ূরবাহন হাসিল, বলিল— কি কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে? রাজা কি ক্ষীরের লাড় যে আমি টপ্ করে মুখে পুরে দেব?

তোমার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে।

তল্লাস করে দেখ, আমার কাছে অস্ত্র নেই।

ধনঞ্জয় কথায় বিশ্বাস করিবার লোক নহেন; তিনি রুদ্ররূপকে ডাকিলেন। রুদ্ররূপ আসিয়া ময়ূরবাহনের বস্ত্রাদি তল্লাস করিল, কিন্তু মারাত্মক কিছুই পাওয়া গেল না।

ময়ূরবাহন বিদ্রূপ করিয়া কহিল—কেমন, আর ভয় নেই তো!

ধনঞ্জয় আবার বলিলেন–আমাদের সামনে বলবে না?

না–ময়ূরবাহন দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল।

তখন ধনঞ্জয় কহিলেন— বেশ। কিন্তু আমরা কাছাকাছি থাকব মনে রেখো। যদি কোনো রকম শয়তানির চেষ্টা কর তাহলে–ধনঞ্জয় মুষ্টি খুলিয়া পিস্তল দেখাইলেন।

ময়ূরবাহন উচ্চৈঃস্বরে হাসিল–সর্দার, তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ। বয়সকালে তোমার ক্ষেত্রিয়াণীকে বোধ হয় এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল করতে না! ক্ষেত্রিয়াণী অবশ্য তোমার চোখে ধুলো দিয়ে–হা হা হা–

হাসিতে হাসিতে ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

.

টর্চের আলো নিবাইয়া ময়ূরবাহন কিয়ৎকাল গৌরীর সঙ্গে ধীরপদে পদচারণ করিল। রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাহাদের পশ্চাতে প্রায় বিশ হাত দূরে রহিলেন।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ময়ূরবাহন বলিল— আপনার সব পরিচয়ই আমরা জানি।

শুষ্কস্বরে গৌরী বলিল—এই কথাই কি এত রাত্রে বলতে এসেছ?

ময়ূরবাহন উত্তর দিল না; কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া যেন আত্মগতভাবেই বলিতে আরম্ভ করিলআপনার ভাগ্যের কথা ভাবলে হিংসা হয়। কোথায় ছিলেন বাংলাদেশের এক নগণ্য জমিদারের ছোট ভাই, হয়ে পড়লেন একেবারে স্বাধীন দেশের রাজা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পেলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার প্রেম। একেই বলে ভগবান যাকে দেন, ছপ্পর ফোড়কে দেন। কিন্তু তবু পৃথিবীতে সবই অনিশ্চিত; অসাবধান হলে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীও রাস্তার ফকির বনে যায়। সুখ সৌভাগ্যকে যত্ন না করলে তারা থাকে না। তাই ভাবছি, আপনার এই হঠাৎ-পাওয়া সৌভাগ্যকে স্থায়ী করবার কোনো চেষ্টা আপনি করছেন কি? অথবা, কেবল কয়েকজন ফন্দিবাজ কুচক্রীর খেলার পুতুল হয়ে তাদের কাজ হাসিল করে দিয়ে শেষে আবার পুনর্মুষিক হয়ে দেশে ফিরে যাবেন?

ময়ূরবাহনের এই ব্যঙ্গপূর্ণ স্বগতোক্তি শুনিতে শুনিতে গৌরীর বুকে রুদ্ধ ক্রোধ গর্জন করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিল না।

ময়ূরবাহন একটা কিছু প্রস্তাব করিতে চায়, তাহা শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া ঝগড়া করা উচিত হইবে না। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল–কাজের কথা যদি কিছু থাকে তো বল। তোমার বেয়াদপি শোনবার আমার সময় নেই।

ময়ূরবাহন অবিচলিতভাবে বলিল–কাজের কথাই বলছি, যা বললাম সেটা ভূমিকা মাত্র। সে টর্চ জ্বালিয়া একবার সম্মুখের পথ খানিকটা দেখিয়া লইল, তারপর আলো নিবাইয়া বলিলউদিতের সঙ্গে আমার আর পোট হচ্ছে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

ময়ুরবাহনের কথার বিষয়বস্তুটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু তাহার বলিবার ভঙ্গি এমন অতর্কিত ও আকস্মিক যে, গৌরী চমকিয়া উঠিল। ময়ূরবাহন বলিল— স্পষ্ট কথার ঘোর-পাঁচ না করে স্পষ্টভাবেই বলতে আমি ভালবাসি। উদিত সিংয়ের মধ্যে আর শাঁস নেই— আছে শুধু। ছোবড়া। তাই স্রেফ ছোবড়া চুষে আমার আর পোষাচ্ছে না।

গৌরী ধীরে ধীরে বলিল— অথাৎ উদিতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাও?

ময়ূরবাহন হাসিল— সাদা কথায় তাই বোঝয় বটে। আপনি বোধ হয় ঐ কথাটা বলে আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নিজের কোনো কাজের জন্য লজ্জা পাবার অবস্থা আমার অনেকদিন কেটে গেছে।

নীরস স্বরে গৌরী বলিল–তাই তো দেখছি। চেহারা ছাড়া মানুষের কোনো লক্ষণই তোমার নেই! যাহোক, তোমার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নেই। কি করতে চাও?

ময়ূরবাহন কিছুক্ষণ কথা বলিল না। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা গেল না; তারপর সে সহজ স্বরেই বলিল— আগেই বলেছি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন; আমার নিজেরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। মনে করুন আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি, তাহলে তার বদলে আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন না?

তুমি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে চাও সেটা আগে জানা দরকার।

সেটা এখনও বুঝতে পারেননি?

না।

বেশ, তাহলে খোলসা করেই বলছি। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে ঝিন্দের গদীতে কায়েমীভাবে বসাতে পারি, এটা অনুমান করা বোধহয় আপনার পক্ষে শক্ত নয়?

কি উপায়ে?

ধরুন, আসল রাজার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়। তিনি যে অবস্থায় আছেন তা প্রায় মৃত্যুতুল্য, তবু যতদিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন আপনি নিষ্কণ্টক হতে পারছেন না। আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি তাহলে আপনার রাস্তা একেবারে সাফ—আপনি যে শঙ্কর সিং নয়, একথা কেউ চেষ্টা করলেও প্রমাণ করতে পারবে না। সিংহাসনে আপনার দাবি পাকা হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন?

গৌরী বুঝিল; আগেও সে বুঝিয়াছিল। প্রলোভন বড় কম নয়। শুধু ঝিন্দের সিংহাসন নয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। তথাপি গৌরীর মন লোভের পরিবর্তে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। স্বার্থে স্বার্থে এই প্রাণপণ টানাটানি, নীচতা চক্রান্ত নরহত্যার এই ঘূর্ণিপাক—ইহার আবর্তে পড়িয়া জগতের অতিবড় লোভনীয় বস্তুও তাহার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিল। সে একবার গা-ঝাড়া দিয়া যেন দেহ হইতে একটা পঙ্কিল অশুচিতার স্পর্শ ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তারপর পূর্ববৎ নিতান্ত নিরুৎসুক স্বরে বলিল— তাহলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজাকে হত্যা। করতেও তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার স্বার্থ-টা কি শুনি?

ময়ূরবাহন বলিল— আমার স্বার্থ গুরুতর না হলে এত বড় একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব আমি পরিকল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আমার অবস্থার কথা প্রকাশ করে বললে আপনি বুঝবেন যে আমার এই প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র ছলনা নেই— এ একেবারে আমার খাঁটি মনের কথা। একটু থামিয়া ময়ূরবাহন সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত বলিতে আরম্ভ করিল–যেন অন্য কাহারও কথা বলিতেছে আমি একজন ঘরানা ঘরের ছেলে এ বোধ হয় আপনি জানেন। বিষয়-আশয় টাকাকড়িও বিস্তর ছিল, কিন্তু সে সব

উড়িয়ে দিয়েছি। গত দুবছর থেকে উদিত সিংয়ের স্কন্ধে। চেপেই চালাচ্ছিলাম কিন্তু এভাবে আর আমার চলছে না। উদিতের রস ফুরিয়ে এসেছে; শুধু তাই নয়, গদানা নিয়েও টানাটানি পড়ে গেছে। লুকোচুরি করে কোনো লাভ নেই, এখন আমি আমার গদানা বাঁচাতে চাই। বুঝতে পারছি উদিতের মতলব শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে কিন্তু আমিও সেই সঙ্গে ডুবতে চাই না। তাকে ঝিন্দের সিংহাসনে বসাতে পারলে আমিই প্রকৃতপক্ষে রাজা হতাম; কিন্তু সে দুরাশা এখন ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই—আপনি এসে সব ওলট-পালট করে দিয়েছেন।

এবার আমার প্রস্তাব শুনুন। এতে আমাদের দুজনেরই স্বার্থ সিদ্ধ হবে অর্থাৎ আপনি ঝিন্দের প্রকৃত রাজা হবেন, আর আমিও গদানা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকব।

গৌরী বলিল— তোমার প্রস্তাব বোধ হয় এই যে, রাজা হবার লোভে আমি তোমার গুদানা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেব—কেমন?

প্রতিশ্রুতি! ময়ূরবাহন মৃদুকণ্ঠে একটু হাসিল—দেখুন, ও জিনিসের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। অবস্থাগতিকে মানুষ প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়; আপনিও হয়তো রাজা হয়ে প্রতিশ্রুতি মনে না রাখতে পারেন। আমার প্রস্তাবটা একটু অন্য ধরনের।

বটে! কি তোমার প্রস্তাব শুনি?

আমার প্রস্তাব খুব মোলায়েম। আমি একটি বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে করতে চাও?

হ্যাঁ। ভেবে দেখুন, বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করবার আমার সময় উপস্থিত হয়েছে।

তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?

আজ্ঞে না, স্থান কাল-পাত্র কোনটাই রসিকতা করবার অনুকূল নয়। আমি খুব গম্ভীরভাবেই বলছি। তবে শুনুন। ত্রিবিক্রম সিংয়ের মেয়ে চম্পাবাঈকে আমি বিয়ে করতে চাই। উদ্দেশ্য খুব সোজা— ময়ূরবাহনের গদানার ওপর কারুর মমতা না থাকতে পারে কিন্তু ত্রিবিক্রম সিংয়ের জামাইয়ের গদীনার দাম যথেষ্টই আছে। চম্পাবাঈকে বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ করাতে সর্দার ধনঞ্জয়েরও সঙ্কোচ হবে। তারপর, ত্রিবিক্রম সিংয়ের ঐ একটি মেয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েই উত্তরাধিকারিণী হবে। সুতরাং, সবদিক দিয়েই চম্পাবাঈ আমার উপযুক্ত পাত্রী।

এই প্রস্তাবের কল্পনাতীত ধৃষ্টতা গৌরীকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক্ করিয়া দিল। চম্পা! অনাঘ্রাত ফুলের মত নিষ্পাপ চম্পাকে এই ক্লেদাক্ত পশুটা চায়! গৌরী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল— তোমার স্পর্ধা আছে বটে।

ঈষৎ বিস্ময়ে ময়ূরবাহন বলিল— এতে স্পর্ধা কি আছে? ত্রিবিক্রম আমার স্বজাতি, বংশগৌরবে আমি তার চেয়ে ছোট নয়, বরং বড়। তবে আপত্তি কিসের?

গৌরী রূঢ়স্বরে বলিল–ও সব আকাশ কুসুমের আশা ছেড়ে দাও। তোমার হাতে মেয়ে দেবার আগে ত্রিবিক্রম চম্পাকে কিস্তার জলে ফেলে দেবে।

তা দিতে পারে, লোকটা বড় একগুঁয়ে। কিন্তু আপনি রাজা—আপনি যদি হুকুম দেন, তাহলে সে না বলতে পারবে না।

আমি হুকুম দেব–চম্পার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে! তুমি তুমি একটা পাগল।

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে বলিল— বিনিময়ে আপনি কি পাবেন সেটাও স্মরণ করে দেখবেন।

ও–গৌরী উচ্চকণ্ঠে হসিল। তাহারা কিস্তার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে পঞ্চাশ হাত দূরে অন্ধকার দুর্গ; সেইদিকে তাকাইয়া গৌরী বলিল— বিনিময়ে রাজাকে হত্যা করে তুমি আমার প্রত্যুপকার করবে—এই না?

সহজভাবে ময়ূরবাহন বলিল–এতক্ষণে আমার সমগ্র প্রস্তাবটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।

গৌরী তিক্তস্বরে কহিল— তুমি মনে কর ঝিন্দের সিংহাসনে আমার বড় লোভ?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া আর একটি লোভনীয় জিনিস আছে— ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈ–

গৌরীর কঠিন স্বর তাহার কথা শেষ হইতে দিল না— চুপ! ও নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না। এবার তোমার প্রস্তাবের উত্তর শোনো-তুমি একটা নরকের কীট, কিন্তু আমাকে লুব্ধ করতে পারবে না। সিংহাসনে আমার লোভ নেই, যা ন্যায়ত আমার নয় তা আমি চাই না। পৃথিবীতে রাজ-ঐশ্বর্যের চেয়েও বড় জিনিস আছে—তার নাম ইমান। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। ময়ূরবাহন, তুমি আমাকে অনেকভাবে ছোট করবার চেষ্টা করেছ, তার মধ্যে আজকের এই চেষ্টা সবচেয়ে অপমানজনক। তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, ইচ্ছে করলে তোমাকে মাছির মত টিপে মেরে ফেলতে পারি, শুধু একটু হুকুমের ওয়াস্তা। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিদ্বেষ এত বেশী যে এভাবে মারলে আমার তৃপ্তি হবে না। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার দিন এখনো আসেনি, কিন্তু সেদিন আসবে–হুঁশিয়ার!

গৌরী খুব সংযতভাবে ওজন করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু শেষের দিকে তাহার কথাগুলা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের অন্তর্গূঢ় গর্জনের মত শুনাইল। সে চুপ করিলে ময়ূরবাহনও কিয়ৎকাল কথা কহিল না; তারপর ধীরে ধীরে কহিল–আপনি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী নন? এই আপনার শেষ কথা?

হ্যাঁ।

ভেবে দেখুন—

দেখেছি। তুমি এখন যেতে পার।

বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আপনি ভাল করলেন না।

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?

ময়ূরবাহন গৌরীর নিকট হইতে দুই-তিন হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল; এবার সে ফিরিয়া টর্চের আলো গৌরীর মুখে ফেলিল, বলিল-না—ভয় দেখিয়ে শত্রুকে সাবধান করে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হলেই সবদিক দিয়ে ভাল হত। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না যে আপনার জীবন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, যে-কোনো মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে। উদিত সিং মরীয়া হয়ে উঠেছে; কোণঠাসা বন-বেড়ালের সঙ্গে খেলা করা নিরাপদ নয়।

গৌরী হাসিল এটা তোমার নিজের কথা, না উদিতের জবানি বলছ?

নিজের কথাই বলছি।

বটে! আর কিছু বলবার আছে?

আছে। ময়ূরবাহনের স্বর বিষাক্ত হইয়া উঠিল—দেবের কথা বলা যায় না, আপনি হয়তো বেঁচে যেতেও পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন, ঝড়োয়ার রানীকে আপনিও পাবেন না, শঙ্কর সিংও পাবে না— তাকে ভোগ-দখল করবে উদিত সিং-বুঝেছেন?-হা-হা-হা-

তাহার হাসি শেষ হইতে না হইতে দুর্গের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। কাঁধের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া গৌরী উঃ করিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় পিছন হইতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন— সরে আসুন! সরে আসুন! ময়ূরবাহন হাতের জ্বলন্ত টর্চটা গৌরীর গায়ে খুঁড়িয়া মারিয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে জলে লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

ধনঞ্জয় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিলেন—চোট পেয়েছেন? কোথায়?

গৌরী বলিল—কাঁধে। বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু ময়ূরবাহনটা পালাল।

অন্ধকার কিস্তার বুক হইতে ময়ূরবাহনের হাসি ভাসিয়া আসিল হা-হা-হা—

ধনঞ্জয় শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না; আবার দুর হইতে হাসির আওয়াজ আসিল। তীব্র স্রোতের মুখে ময়ূরবাহন তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে বলিলেন–তুমি যাও; পুলের মুখে আমাদের লোক আছে, সেখানে যদি ময়ূরবাহন জল থেকে ওঠবার চেষ্টা করে, তাকে ধরবে।

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় তখন গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনার আঘাত গুরুতর নয়? সত্যি বলছেন?

গৌরী বলিল—এখন সামান্য একটু চি-চিন্ করছে। বোধ হয় কাঁধের চামড়াটা ছিঁড়ে গেছে।

যাক, কান ঘেঁষে গেছে। চলুন— ছাউনিতে ফেরা যাক।

চল।

যাইতে যাইতে ধনঞ্জয় বলিলেন—উঃ-কি ভয়ানক শয়তানি বুদ্ধি। নিজে নিরস্ত্র এসেছে, আর দুর্গে লোক ঠিক করে এসেছে। কথায় বার্তায় আপনাকে দুর্গের কাছে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তারপর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলেছে— যাতে দুর্গ থেকে বন্দুকবাজ আপনাকে দেখতে পায়। ব্যাপারটা ঘটবার আগে পর্যন্ত ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি।

না। কিন্তু আমি ভাবছি, ময়ূরবাহন শেষকালে যা বললে তার মানে কি!

কি বললে?

গৌরী জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল। বলিল—কিছু না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার অগাধ জলে

পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি প্রাতরাশ শেষ করিয়া গৌরী একাকী তাহার খাস তাম্বুতে একটা কৌচে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল। তাম্বুটি বিস্তৃত ও চতুষ্কোণ, মেঝেয় গালিচা বিছানো। মাথার উপর ঝাড় ঝুলিতেছে, দেয়ালে আয়না ছবি প্রভৃতি বিলম্বিত। দরজা জানালাও পাকা বাড়ির মত, ইহা যে বস্ত্রাবাস মাত্র তাহার কক্ষের আভ্যন্তরিক চেহারা দেখিয়া অনুমান করাও যায় না। ভোলা বাতায়ন পথে নিকটবর্তী অন্য তাম্বুগুলি দেখা যাইতেছে— প্রশান্ত প্রভাত রৌদ্রে বাহিরের দৃশ্যটা যেন চিত্রার্পিতবৎ মনে হয়।

গতরাত্রে গৌরী ঘুমাইতে পারে নাই। কাঁধের আঘাতটা যদিও সামান্যই তবু নিদ্রার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছে। তাহার উপর চিন্তা। বিনিদ্র রজনীর সমস্ত প্রহর ব্যাপিয়া তাহার মনে চিন্তার আলোড়ন চলিয়াছে।

অবশেষে এই দুশ্চিন্তা-সমুদ্র মন্থন করিয়া মনে একটা সঙ্কল্প জাগিয়াছে। সেই অপরিণত সঙ্কল্পটাকেই কার্যে পরিণত করিবার উপায় সে আজ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় ধনঞ্জয় এত্তালা পাঠাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা খোলা চিঠি।

অভিবাদন করিয়া ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন– আজ কেমন বোধ করছেন? কাঁধটা–?

গৌরী বলিল— ভালই। একটু টাটিয়েছে—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

ধনঞ্জয় বলিলেন— আঘাত ভগবানের কৃপায় অল্পই, ব্যাণ্ডেজও যথাসাধ্য ভাল করে বাঁধা হয়েছে; তবু গঙ্গানাথকে খবর পাঠালে হত না? সে বৈকাল নাগাদ এসে পড়তে পারত।

গৌরী বলিল— অনর্থক হাঙ্গামা করো না সর্দার। গঙ্গানাথের আসবার কোনো দরকার নেই। তোমার হাতে ওটা কি?

ঈষৎ হাসিয়া চিঠিখানা ধনঞ্জয় গৌরীর হাতে দিলেন উদিতের চিঠি। আমরা নাকি কাল রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর বন্ধু ময়ূরবাহনকে মেরে ফেলেছি; তাই আজ আর তিনি শিকারে আসবেন না।

চিঠি পড়িয়া গৌরী মুখ তুলিল–ময়ূরবাহন কি সত্যিই মরেছে নাকি?

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িলেন–ময়ূরবাহন এত সহজে মরবে বলে তো মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, এই চিঠি লিখে উদিত আমাদের চোখে ধুলো দিতে চায়; ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরে গেছে। যদিও ফিরল কি করে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দুর্গের মুখে রুদ্ররূপ পাহারায় ছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে ঢুকতে পারেনি। তবে ঢুকলো কোথা দিয়ে?

কিস্তার টানে সত্যিই ভেসে যেতে পারে না কি?

একেবারে অসম্ভব বলছি না। কিন্তু ভেবে দেখুন, সে আপনাকে খুন করে জলে লাফিয়ে পড়বে বলে কৃতসঙ্কল্প হয়ে এসেছিল। যদি তার দুর্গে ফেরবার কোনো পথই না থাকবে, তবে সে অতবড় দুঃসাহসিক কাজ করবে কেন? ...

গৌরী ভাবিয়া বলিল— তা বটে। হয়তো জলের পথে দুর্গে ঢোকবার কোনো গুপ্তপথ আছে।

সেই কথা আমিও ভাবছি। ময়ূরবাহন যদি কিস্তার প্রপাতের মুখে পড়ে গুঁড়ো হয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে কোনো গুপ্তপথ দিয়ে দুর্গে ঢুকছে। কিন্তু কোথায় সে গুপ্তপথ?

গুপ্তপথ কোথায়, তা যখন আমরা জানি না তখন বৃথা জল্পনা করে লাভ নেই। উদিত আমাদের বোঝাতে চায় যে ময়ূরবাহন মরে গেছে— যাতে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। তার মানে ওরা একটা নূতন শয়তানী মতলব আঁটছে। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কর্তব্য কি?

সদর বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। দাবা খেলিতে বসিয়া বাজি এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কোনো পক্ষই নূতন চাল দিতে সাহস করিতেছে না, পাছে একটা অচিন্তিত বিপর্যয় ঘটিয়া যায়।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গৌরী হঠাৎ বলিল— সর্দার, শঙ্কর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে না পারলে কোনো কাজই হবে না। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ভ্রূ তুলিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন– কিন্তু কি করে দেখা করবেন?

ঐ জানালা দিয়ে। তাঁর অবস্থাটা জানা দরকার। বুঝছ না, আমরা যে তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা করছি, একথা তিনি হয়তো জানেনই না। তাঁকে যদি খবর দিতে পারা যায়, তাহলে তিনিও তৈরি থাকতে পারেন। তাছাড়া আমরাও তাঁর কাছ থেকে এমন খবর পেতে পারি যাতে উদ্ধার করা সহজ হবে। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে–

কি মতলব?

এই সময় রুদ্ররূপ প্রবেশ করিয়া জানাইল যে কিস্তার পরপার হইতে অধিক্রম সিং মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

আলোচনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। অধিক্রম সিং আসিয়া প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে একটি সুবর্ণ থালির উপর কয়েকটি হরিদ্রারঞ্জিত সুপারি। তিনি কন্যার বিবাহে ঝিন্দের মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন।

ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শিষ্টাচারসম্মত অত্যুক্তি ও বিনয়বচনের বিনিময় চলিল। তারপর অধিক্রম সিং আর্জি পেশ করিলেন। কন্যার বিবাহে দীনের ভবনে দেবপাদ মহারাজের পদধুলি পড়িলে গৃহ পবিত্র হইবে। অদ্য রাত্রেই বিবাহ। কন্যার সখী মহামহিমময়ী ঝড়োয়ার মহারানী স্বয়ং আসিয়াছেন; এরূপক্ষেত্রে দেবপাদ মহারাজও যদি বিবাহমণ্ডপে দেখা দেন তাহা হইলে বরকন্যার ইহজগতে প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকিবে না ইত্যাদি।

আদবকায়দা-দুরস্ত বাক্যোম্মসের মধ্য হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে মহারাজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলে অধিক্রম সত্যই কৃতার্থ হইবেন। মহারাজ কিন্তু তাঁহার বাক্‌বিন্যাস শুনিতে শুনিতে ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, অধিক্রম থামিলে তিনি সজাগ হইয়া বলিলেন,—সর্দারজী, আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আপ্যায়িত হলাম। কৃষ্ণাবাঈ আর বিজয়লাল দুজনেই আমার প্রিয়পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। আজ রাত্রে আমার অন্য কাজ আছে।

অধিক্রম নিরাশ হইলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইল। গৌরী বলিল— আপনি দুঃখিত হবেন না! নবদম্পতিকে আমি এখান থেকেই আশীবাদ করছি। তাছাড়া, স্বয়ং মহারানী যেখানে উপস্থিত, সেখানে আমার যাওয়া না-যাওয়া সমান।

অধিক্রম জোড়হস্তে নিবেদন করিলেন— মহারাজ, আপনার অনুপস্থিতিতে শুধু যে আমরাই মর্মাহত হব তা নয়, মহারানীও বড় নিরাশ হবেন। আমি কৃষ্ণার মুখে শুনেছি,

তিনি আপনার প্রতীক্ষায় কুণ্ঠিতভাবে অধিক্রম কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন। রাজারানীর অনুরাগের কথা, মধুর হইলেও প্রকাশ্যে আলোচনীয় নয়।

তবু অধিক্রম যেটুকু ইঙ্গিত দিলেন তাহাতেই গৌরীর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ দৃষ্টিহীন চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া বলিল— অধিক্রম সিং, আজ আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো অন্য কখনো আপনারা বোধ হয় জানেন না, কৃষ্ণার কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু এবার সে ঋণ শোধ করতে পারলাম না। যাহোক, আশা রইল, কখনো না কখনো শোধ করব। আপনি দুঃখ করবেন না, বর-কন্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে আশীবাদ করছি, তারা সুখী হবে।

অগত্যা অধিক্রম ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিদায় লইলেন। গৌরী আবার জানালার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর গৌরী ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া দেখিল তিনি তাহার দিকেই তাকাইয়া আছেন; তাঁহার মুখে একটা নিতান্তই অপরিচিত কোমলভাব। এই লৌহকঠিন যোদ্ধার মুখে এমন ভাব গৌরী আর কখনো দেখে নাই।

ধনঞ্জয় নরমসুরে বলিলেন— আপনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলেই পারতেন। অধিক্রম দুঃখিত হল।

গৌরীর মুখে একটা ব্যঙ্গহাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল— নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে তুমি খুশি হতে?

www.bengaliebook.com

নিশ্চয়।

কিন্তু ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে আমার দেখা হত যে! তাতেও কি তুমি খুশি হতে সর্দার?

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন–কিছুদিন আগে খুশি হতাম না বরং বাধা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! আজ আপনাকে আর কস্তুরীবাঈকে একত্র কল্পনা করে মনে কোনো রকম অশান্তি বোধ করছি না; বরঞ্চ— আপনি না হয়ে যদি শঙ্কর সিং— সহসা দুই হস্ত আবেগভরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন— ভগবানের কি অবিচার! কেন আপনি শঙ্কর সিং হয়ে জন্মালেন না?

বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে সদারের এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহ গৌরীরও বহুতুলব্ধ চিত্তের দৃঢ়তা যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাহার মনটা দ্রবীভূত হইয়া একরাশ অশ্রুর মত টলটল করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—কী ক্ষতি হত পৃথিবীর যদি আপনি শঙ্কর সিং হতেন? আমি শঙ্কর সিংয়ের বাপদাদার নিমক খেয়েছি, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে মোহ আমার নেই শঙ্কর সিং আপনার পায়ের নখের যোগ্য নয়। অথচ যখন মনে হয়, আপনি একদিন ঝি ছেড়ে চলে যাবেন, আর শঙ্কর সিং ঝড়োয়ার রানীকে বিবাহ করে গদীতে বসবেন—

এবার গৌরী প্রায় রূঢ়স্বরে বাধা দিল, বলিল— ব্যস! সর্দার, আর নয়, যা হবার নয় তা নিয়ে আক্ষেপ কোরো না। এস এখন পরামর্শ করি। আমার প্রস্তাবটা তোমাকে বলা হয়নি।

ধনঞ্জয় যেন হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া নীরস কঠোরস্বরে বলিল—বলুন।

মধ্যরাত্রির ঘড়ি বাজিয়া যাইবার পর গৌরী, রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় চুপিচুপি শিবির হইতে বাহির হইলেন। ছাউনি নিস্তব্ধ-শিবির-বেষ্টনীর দ্বারমুখে বন্দুকধারী প্রহরী নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল।

পূর্বরাত্রে যেখানে ময়ূরবাহন কিস্তার জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল সেইস্থানে আবার তিনজনে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোনো কথা হইল না, অন্ধকারে গৌরী নিজের গাত্রবস্ত্র খুলিতে লাগিল।

বহু আলোচনার পর কর্তব্য স্থির হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গৌরী সন্তরণে দুর্গের নিকটে যাইবে। সে সন্তরণে পটু, কিস্তার স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। দুর্গের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যে-জানালার কথা প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, সে সেই জানালার নিকটবর্তী হইবে। রাত্রে জানালায় সাধারণত দীপ জ্বলে, সুতরাং লক্ষ্য হারাইবার ভয় নাই। জানালা জল হইতে দুই-তিন হাত উর্ধ্বে, বাহির হইতে কক্ষের অভ্যন্তর একটু উঁচু হইলেই দেখা যাইবে। শব্দ হইবার আশঙ্কাও নাই, কিস্তার গর্জনে

অন্য শব্দ চাপা পড়িয়া যাইবে। গৌরী জানালা দিয়া কক্ষের অভ্যন্তর দেখিবে। রাজা সেখানে বন্দী আছেন কিনা এবং রাজার সহিত কোনো প্রহরী আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি না থাকে তাহা হইলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবে। তারপর দুর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া রাজাকে উদ্ধারের আশ্বাস দিয়া ফিরিয়া আসিবে।

গৌরীকে এই সঙ্কটময় কার্যে একাকী পাঠাইতে সর্দার ধনঞ্জয় প্রথমে সম্মত হন নাই; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ ও অধীর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গৌরীর মনের অবস্থা এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহাকে বাধা দিলে সে আরও দুর্নিবার হইয়া উঠিবে।

রুদ্ররূপ তাঁহাদের পরামর্শে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে হাঁ-না কোনো মন্তব্যই প্রকাশ করে নাই।

গৌরী কাপড়-চোপড় খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কালো রংয়ের হাঁটু পর্যন্ত হাফ-প্যান্ট ছিল; আর কোনো আবরণ নাই, ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। কারণ সাঁতারের সময় গায়ে বস্ত্রাদি যত কম থাকে ততই সুবিধা। অস্ত্রও কিছু সঙ্গে লওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই; তবু ধনঞ্জয় একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুপুরীর নিকটস্থ হওয়া অনুমোদন করেন নাই। অনিশ্চিতের রাজ্যে অভিযান; কখন কি প্রয়োজন হইবে স্থির নাই—এই ভাবিয়া গৌরী তাহার দাদার দেওয়া ছোরাটা কোমরে খুঁজিয়া লইয়াছিল। ইহা যে সত্যই কোনো কাজে লাগিবে তাহা সে কল্পনা করে নাই; একটা সুদুর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া অনাবশ্যক, বুঝিয়াও

লইয়াছিল। নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ঐ ছোরা যে আজ নিয়তির ইঙ্গিতেই তাহার সঙ্গী হইয়াছে তাহা সে কি করিয়া জানিবে?

বস্ত্রাদি বর্জনপূর্বক প্রস্তুত হইয়া গৌরী অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করিয়া দেখিল, রুদ্ররূপও ইতিমধ্যে গাত্রাবরণ খুলিয়া তাহারি মত কেবল জাঙিয়া পরিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল—এ কি রুদ্ররূপ!

রুদ্ররূপ বলিল— আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

গৌরী কিছুক্ষণ নিবা হইয়া রহিল। রুদ্ররূপ নিজ অভিপ্রায় পূর্বাহ্নে কিছুই প্রকাশ করে নাই। সে অল্পভাষী, তাই তাহার মনের কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না। গৌরীর প্রতি তাহার আনুরক্তি যে কতখানি তাহা অবশ্য গৌরী জানিত, কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল যাত্রায় সে যে সহসা কোনো কথা না বলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা গৌরী ভাবিতে পারে নাই; তাহার বুকে একটা অনির্দিষ্ট ভার চাপানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ হাল্কা হইয়া গেল। তবু সে বলিল—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গেলে কি সুবিধে হবে—

রুদ্ররূপ দৃঢ়স্বরে বলিল— মহারাজ, আমাকে বারণ করবেন না। সুবিধা অসুবিধা জানি না, কিন্তু আজ আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।

গৌরী তাহার পাশে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া একটু চাপ দিল, অস্ফুটস্বরে বলিল—বেশ, চল। তোমাতে আমাতে যে কাজে বেরিয়েছি তা কখনো নিস্ফল হয়নি। কিন্তু তুমি ভাল সাঁতার জানো তো?

জানি মহারাজ।

বেশ। এস তাহলে।

কিস্তার পরপারে অধিক্রম সিংয়ের বাগানবাড়িতে তখন সহস্র দীপ জ্বলিতেছে; মিঠা মৃদু শানায়ের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণার আজ বিবাহ। রানী কস্তুরী ঐ দীপোজ্জল ভবনের কোথাও আছেন, হয়তো তিনি আজিকার রাত্রে গৌরীর কথাই ভাবিতেছেন। তোহে ন বিসরি দিন রাতি। এদিকে শক্তিগড়ের কৃষ্ণমূর্তি কিস্তার বুকের উপর দুস্তর ব্যবধানের মত দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে একটিমাত্র আলোকের ক্ষীণ শিখা দেখা যাইতেছে। শঙ্কর সিং হয়তো ঐ কক্ষে বন্দী। আর ময়ূরবাহন? সে কোথায়? সে কি সত্যই বাঁচিয়া আছে?

ধনঞ্জয় তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; গৌরী ও রুদ্ররূপ সন্তর্পণে জলে নামিয়া নিঃশব্দে দুর্গের দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বন্ধু

মিনিট দুই সজোরে হাত ছুঁড়িবার পর ঠাণ্ডা জল গা-সওয়া হইয়া গেলে গৌরী দেখিল, সাঁতার কাটিবার প্রয়োজন নাই, নদীর স্রোত তাহাদের সেই দীপান্বিত গবাক্ষের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দুইজনে তখন কেবলমাত্র গা ভাসাইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিল।

জল হইতে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না; চারিদিকে কেবল নক্ষত্রালোক খচিত মসীকৃষ্ণ জলরাশি। গৌরী ও রুদ্ররূপ যতই দুর্গের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, জলের কল্লোলধ্বনি ততই বাড়িয়া চলিল; মগ্ন পাথরের সংঘাতে একটানা স্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গৌরী দেখিল, তাহারা আর সিধা সেই গবাক্ষর দিকে যাইতেছে না, বাধাপ্রাপ্ত জলধারা তাহাদের ভিন্নমুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গৌরী প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া নিজের গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর দেখিল বৃথা চেষ্টা, দুবার জলস্রোতে ইচ্ছামত চলা অসম্ভব। নিরুপায়ভাবেই দুইজনে ভাসিয়া চলিল।

ক্রমশ দুর্গের বিশাল ছায়ার তলে তাহারা আসিয়া পৌঁছিল। এখানে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তিও অন্ধ হইয়া গিয়াছে—চোখের দৃষ্টি জমাট অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। গবাক্ষের আলোটিও বামদিকের আলোড়িত তমিস্রায় কখন ডুবিয়া গিয়াছে।

দুর্গের প্রাচীর আর কতদূরে তাহাও অনুমান করা অসম্ভব। গৌরীর ভয় হইতে লাগিল, এইবার বুঝি তাহারা সবেগে দুর্গের পাষাণগাত্রে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবে। সে মৃদুস্বরে একবার রুদ্ররূপকে ডাকিল; রুদ্ররূপ তাহার দুইহাত অন্তরে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল—ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

গৌরী বলিল-হুঁশিয়ার! সামনেই দুর্গ, জখম হয়ো না।

রুদ্ররূপ বলিল—না। আপনি সাবধান।

অন্ধকারে গৌরী হাসিল। দুইজনেই দুইজনকে সাবধান করিয়া দিল বটে কিন্তু সত্যই দুর্গের গায়ে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইলে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে কেহই ভাবিয়া পাইল না। বিক্ষুব্ধ জলরাশির বুকে তৃণখণ্ড! তাহাদের ইচ্ছার শক্তি কতটুকু?

গৌরীর মনে হইল, আজিকার এই নিঃসহায়ভাবে ভাসিয়া-চলা তাহার জীবনের একটা বৃহত্তর সত্যের প্রতীক। দৈবী খেয়ালের দুর্নিবার টানে সে তো অনেকদিন হইতেই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত। ভাসিয়া চলিয়াছে। পাষাণ প্রাকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া এতদিন চূর্ণ হইয়া যায় নাই কেন, ইহাই আশ্চর্য। কে জানে, হয়তো আজিকার জন্যই নিয়তি অপেক্ষা করিয়া ছিল—তাহার লক্ষ্যহীন ভাসিয়া-চলাকে পরিসমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু কোথায় সে উপকূল? বৈতরণীর এপারে, না ওপারে?

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এই সময় গৌরীকে বিপর্যস্ত নিমজ্জিত করিয়া তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য একটা মগ্ন পাথরের পিচ্ছিল অঙ্গ তাহাকে স্পর্শ করিল; তারপর জলের উপর মাথা জাগাইয়া সে দেখিল-স্রোতের এলোমেলো গতি আর নাই, অপেক্ষাকৃত শান্ত জলের মন্থর। একটা ঘূর্ণির মধ্যে সে ধীরে ধীরে পাক খাইতেছে। সম্ভবত জলমগ্ন পাথরগুলা এইখানে এমন একটা সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করিয়াছে যাহাতে স্রোতের প্রবল গতি ব্যাহত হইয়া যায়; ঐ বড় ঢেউটা গৌরীকে সেই মজ্জিত প্রাচীরের পরপারে আনিয়া দিল। ঘূর্ণির চক্রে আবর্তমান তাহার দেহটা দুর্গের দেয়ালে গিয়া ঠেকিল।

এখানেও ডুব জল, মসৃণ দুর্গ-গাত্রে কোথাও অবলম্বন নাই; তবু এই শৈবালপিচ্ছিল দেয়ালে হাত রাখিয়া গৌরীর মনে হইল, সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে। ক্ষণকাল জিরাইয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—রুদ্ররূপ, কোথায় তুমি?

রুদ্ররূপ জবাব দিল—এই যে, দেয়ালে এসে ঠেকেছি! আপনি?

আমিও। এস, বাঁ দিকে জানালাটা আছে, সেইদিকে যাওয়া যাক। দেয়াল ধরে ধরে এস।

আচ্ছা।

তখন পৃথিবীর আদিম পঙ্ক শয্যার উপর অন্ধ মহীলতার মত দুইজনে কেবল স্পর্শানুভূতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দশ মিনিট, পনের মিনিট এমনি ভাবে

কাটিয়া গেল; কিন্তু জানালার দেখা নাই। গৌরীর আশঙ্কা হইল হয়তো তাহারা কখন অজ্ঞাতে জানালার নীচে দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, জানিতে পারে নাই।

সে পিছু ফিরিয়া রুদ্ররূপকে সম্বোধন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঠিক মাথার উপর একটা অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; তাহার অনুচ্চারিত সুর কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। জানালার আলো দূর হইতে দেখা যায়, কিন্তু নীচে হইতে তাহা অদৃশ্য। গৌরী উর্ধ্বে হাত বাড়াইয়া অনুভব করিয়া দেখিতে লাগিল; জানালার কিনারা হাতে ঠেকিলজল হইতে দুই-আড়াই হাত মাত্র উর্ধ্বে।

আবার জানালার ভিতর হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর আসিল—বেইমান, তুই তবে আমাকে মেরে ফ্যাল, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

গৌরী নিজের গলার স্বর চিনিতে পারিল; কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আনচান করিয়া উঠিল; মনে হইল সে নিজেই ঐ কারাকুপে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু কামনা করিতেছে।

এবার দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শুনা গেল; কশাইয়ের ছুরির মত তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর কোমলতার বাষ্প পর্যন্ত কোথাও নাই ব্যস্ত হয়ো না; দরকার হয়নি বলেই এতদিন মারিনি, তোমার প্রতি মমতাবশত নয়। কিন্তু আর দেরি নেই, আজই যাহোক একটা হবে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর আবার শঙ্কর সিং কথা কহিল। এবার তাহার স্বর অত্যন্ত কাতর, মিনতি-বিগলিত—উদিত, আমার প্রতি কি তোমার এতটুকু দয়া হয় না? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। আমি রাজ্য চাই না, আমায় শুধু ছেড়ে দাও–

আর তা হয় না। তোমার বন্ধু ধনঞ্জয় সর্দার সব মাটি করে দিয়েছে।

কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। আমি তো তোমাকে সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।

এখন তোমার সিংহাসন ছাড়া না-ছাড়া সমান। ঝিন্দের গদীতে একটা বাঙালী কুত্তা বসে সদারি করছে। শয়তানের বাচ্চা মরেও মরে না। সে যদি মরত তাহলে তোমার ফুরসৎ হয়ে যেত। যাক, আজকের কাজে যদি সিদ্ধ হই তখন তোমার কথা ভেবে দেখব। এখন ঘুমোও।

গৌরী গবাক্ষের কানায় আঙুল রাখিয়া বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে নিজেকে তুলিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল। পাথর কুঁদিয়া বাহির করা অপরিসর একটি প্রকোষ্ঠ—মোমবাতির আলোয় অল্পমাত্র আলোকিত। গবাক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে লোহার ভারী দরজা বন্ধ রহিয়াছে। দেয়ালে সংলগ্ন একটা লম্বা বেদীর মত আসন, বোধ হয় ইহাই বন্দীর শয্যা। এই বেদীর উপর গালে হাত দিয়া উদিত বসিয়া আছে, তাহার কোলের উপর একটা ভোলা তলোয়ার। আর উদিতের অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার পানে করুণনেত্রে চাহিয়া আছে—শঙ্কর সিং। পরিধানে কেবল একটি হাফ-প্যান্ট, উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কয়েদীর সাজ।

তাহার মুখে দুর্দশা ও দৈহিক গ্লানির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। চোখের কোণ হইতে গভীর কালির আঁচড় ক্ষতরেখার মত গণ্ডের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে; অধররাষ্ঠের দুই প্রান্ত নত হইয়া ক্লিষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে; বাহু ও কণ্ঠের পেশী ঈষৎ শীর্ণ। তবু, অবস্থার নিদারুণ প্রভেদ সত্ত্বেও, গৌরীর সহিত তাহার সর্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য অদ্ভুত। গৌরী সম্মোহিতের মত শঙ্কর সিংয়ের পানে তাকাইয়া রহিল।

উদিত সূকুটি করিয়া চিন্তা করিতেছিল, শঙ্কর সিংয়ের দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত হাস্য শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। শঙ্কর সিং খলিতস্বরে বলিল-ঘুম! ঘুম আমার আসে না।

ঘুম না আসে—মদ খাও। বিরক্ত তাচ্ছিল্যভরে ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উদিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বদ্ধ কক্ষে বাতাসের অভাব বোধ হয় তাহাকে পীড়া দিতেছিল, সে জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

গৌরী নিঃশব্দে নিজেকে জলের মধ্যে নামাইয়া দিয়া জানালা ছাড়িয়া দিল। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে ফিরিয়া চলিল।

রুদ্ররূপের গায়ে তাহার হাত ঠেকিল। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিল—ফিরে চল।

জানালা হইতে পঁচিশ গজ গিয়া তাহারা থামিল।

রুদ্ররূপ জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখলেন?

গৌরী বলিল—শঙ্কর সিং আর উদিত। উদিত পাহারা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আজ রাত্রেই ওরা একটা কিছু করবে।

কি করবে?

জানি না। হয়তো—

গতরাত্রে ময়ূরবাহনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা তাহার স্মরণ হইল। কি করিতে চায় উহারা? কোন্ দিক দিয়া আক্রমণ করিবে? কস্তুরীর বিরুদ্ধে কি কোনো মতলব আঁটিতেছে? কিন্তু তাহাতে উহাদের লাভ কি? তাহাতে ঝিন্দের সিংহাসন তো সুলভ হইবে না।

কিস্তার দক্ষিণ কুলে কৃষ্ণার বিবাহোৎসবের দীপগুলি এক ঝাঁক খদ্যোতের মত মিটমিট করিতেছে; দক্ষিণ কুল অন্ধকার। গৌরী ভাবিল—আর এখানে থাকিয়া লাভ নাই, শঙ্কর সিংয়ের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে না; স্বয়ং উদিত তাহাকে পাহারা দিতেছে। সম্ভবত উদিত আর ময়ূরবাহন পালা করিয়া পাহারা দিয়া থাকে। দুর্গে অন্য যাহারা আছে, তাহারা হয়তো বন্দীর পরিচয় জানে না; কিম্বা জানিলেও উদিত তাহাদের বিশ্বাস করিয়া রাজার পাহারায় রাখে না। দুর্গে আর কাহারা আছে? দুই-চারি জন অনুগত ভৃত্য,

আর দুই-চারি জন রাজদ্রোহী বন্ধু! আশ্চর্য! এই মুষ্টিমেয় নোক লইয়া উদিত একটা রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে তাচ্ছিল্যভরে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

এই সব অফলপ্রসু চিন্তা ত্যাগ করিয়া গৌরী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, হঠাৎ নিকটেই জাঁতা ঘোরানোর মত গড় গড় শব্দে সে থামিয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ভৌতিক হাসির শব্দ যেন দুর্গের পাথর ভেদ করিয়া তাহার কানে ভাসিয়া আসিল; গৌরীর সর্বাঙ্গের স্নায়ু-পেশী সহসা শক্ত হইয়া উঠিল।

ময়ুরবাহনের হাসি! তবে সে মরে নাই!

কিন্তু হাসির শব্দটা আসিল কোথা হইতে?

সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিতেই গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্ররূপকে টানিয়া দুর্গের দেয়ালের গায়ে একেবারে সাঁটিয়া গেল। মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দক্ষিণে দুর্গের গাত্রে পীতবর্ণ আলোকের একটি চতুষ্কোণ দেখা দিয়াছে।

জাঁতার মত গড় গড় শব্দ করিয়া এই চতুষ্কোণ প্রস্থে বাড়িতে লাগিল। প্রায় আট ফুট উচ্চ ও ছয় ফুট চওড়া একটি দ্বার ধীরে ধীরে কর্কশ অসমতল দেয়ালে আত্মপ্রকাশ করিল।

গুপ্তদ্বার! এই পথেই গতরাত্রে ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরিয়াছিল! গৌরী ও রুদ্ররূপ নিশ্বাস রোধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট কথার শব্দ গুপ্তঘারের অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিল। যেন তাহারা একটা ভারী জিনিস বহন করিয়া আনিতেছে। ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ডিঙির অগ্রভাগ দ্বারমুখে বাহির হইয়া আসিল।

আস্তে! হুঁশিয়ার! ময়ূরবাহনের গলা।

নৌকা ছপাৎ করিয়া জলে পড়িল। ময়ূরবাহন দড়ি ধরিয়া ছিল, টানিয়া নৌকা দ্বারের মুখে লইয়া আসিল।

স্বরূপদাস, তুমি মোটা মানুষ, আগে নৌকায় নামো।—একজন স্থূলকায় লোক সন্তর্পণে নৌকায় নামিল—দাঁড় ধর।

এবার তুমি। আর একজন নৌকায় নামিল।

তখন দড়ি নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ময়ূরবাহন লঘুপদে নৌকায় লাফাইয়া পড়িল। নৌকা টলমল করিয়া উঠিল; ময়ূরবাহন হাসিল—সেই বিজয়ী বেপরোয়া হাসি। গুপ্তদ্বারের দিকে ফিরিয়া বলিল—দরজা খোলা থাক, আর তুমি লণ্ঠন নিয়ে এইখানে বসে থাকো—

নইলে ফেরবার সময় দরজা খুঁজে পাব না। কখন ফিরব ঠিক নেই, হয়তো রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। হুঁশিয়ার থেকো।

দ্বারের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—যো হুকুম।

ময়ূরবাহন বলিল—দাঁড় চালাও।

ক্ষুদ্র তরী তিনজন আরোহী লইয়া পলকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গৌরী চক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—নৌকাটা কোন্ দিকে যাইতেছে, কিন্তু কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিল না। আকাশ ও জলের ঘন তমিস্রার মধ্যে নৌকা যেন মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কাটিল।

তারপর গৌরী রুদ্ররূপের মাথাটা নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুপি চুপি বলিল—রুদ্ররূপ, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

রুদ্ররূপ সচকিতে বলিল—আর আপনি?

আমি এই পথে দুর্গে ঢুকব।

কিন্তু–

গৌরী সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া রুদ্ররূপের কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমার হুকুম, দ্বিরুক্তি কোরো না। এমন সুযোগ আর আসবে না। তুমি তাঁবুতে ফিরে গেলে ধনঞ্জয় আর বিশ জন সিপাহী নিয়ে দুর্গের পুলের মুখে লুকিয়ে থাকবে। আমি দুর্গের ভিতর ঢুকছি, যেমন করে পারি দুর্গের সিংদরজা খুলে দেব। বুঝেছ?

বুঝেছি। রুদ্ররূপের স্বর আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মত ভাবহীন।

গুপ্তঘারে একটা মাত্র লোক আছে, সে আমাকে আটকাতে পারবে না। তারপর দুর্গের ভিতরকার অবস্থা বুঝে যেমন হয় করব। উদিত রাজাকে পাহারা দিচ্ছে, ময়ূরবাহন নেই—দুর্গে হয়তো কয়েকজন চাকর বাকর মাত্র আছে। এই সুযোগ। ময়ূরবাহন ফেরবার আগেই কাযযাদ্ধার করতে হবে। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।

যো হুকুম–রুদ্ররূপ সাঁতার দিবার উপক্রম করিল।

গৌরী আস্তে আস্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—স্রোত ঠেলে যেতে পারবে না, বরং স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও—দুর্গ পেরিয়ে কিনারায় উঠতে পারবে।

রুদ্ররূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল। এতক্ষণ দিব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে তবু একজন অদৃশ্য সহচর ছিল, এখন সে-ও গেল। গৌরী একা!

ছোরাটা সে কোমর হইতে হাতে লইল। তারপর অতি সাবধানে গুপ্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

জল হইতে এক হাত উচ্চে গুপ্তঘার। গৌরী কোণ হইতে সরীসৃপের মত মাথা তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। সম্মুখেই একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার ওপারে কি আছে দেখা যায় না। ক্রমে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিল—সুড়ঙ্গের মত গুপ্তঘার ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—অস্পষ্ট অন্ধকার; হয়তো অপর প্রান্তে দুর্গের উপরে উঠিবার সোপান আছে।

চক্ষু আলোকে আরও অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিতে পাইল, লণ্ঠনের দুই-তিন হাত পিছনে একটা লোক দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না, একটা হাত কপালের উপর ন্যস্ত; বোধ হয় একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছে, কিম্বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে আর কেহ নাই।

গৌরী একবার চক্ষু মুদিয়া নিজেকে সুস্থ ও সংযত করিয়া লইল। তারপর দ্বারের কানায় ভর দিয়া জল হইতে উঠিয়া সিক্তদেহে দ্বারমুখে দাঁড়াইল।

উপবিষ্ট লোকটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌরী ছোরা তুলিয়া এক লাফে তাহার সম্মুখীন হইল।

মহারাজ!

গৌরীর উদ্যত ছোরা অর্ধপথে রুখিয়া গেল। কণ্ঠস্বর পরিচিত।

গৌরী লণ্ঠনের আলোকে লোকটার ত্রাসবিস্ময়-বিকৃত মুখের পানে চাহিল। মুখখানা চেনা-চেনা। কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে?

তারপর সহসা স্মৃতির দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। গৌরীর হাতের ছোরা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে বিপুল আবেগে তাহাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া প্রায় চিঙ্কার করিয়া উঠিল—প্রহ্লাদ!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাল রাত্রি

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল।

কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কস্তুরী শ্রান্তদেহে দ্বিতলে নিজের শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ঘরে তৈলের বাতি জ্বলিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ আলোকে কস্তুরী একবার চারিদিকে চাহিল। বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত কক্ষ, মধ্যস্থলে একটি মখমলে মোড়া পালঙ্ক। নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ভাবিল, আর কৃষ্ণা তাহার শয়নসঙ্গিনী হইবে না।

ক্লান্তিতে শরীর ভরিয়া গিয়াছে, তবু শয্যা আশ্রয় করিতে মন চাহিল না। কস্তুরী ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণার বিবাহের প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে; সে আন্দোলন এখনো থামে নাই।

জানালার বাহিরে হৈমন্তী রাত্রির দেহও যেন ধীরে ধীরে হিম হইয়া আসিতেছে। উদ্যানে দুই-চারিটা আলো দূরে দূরে জ্বলিতেছে; গাছের শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া একটা অপরিস্ফুট প্রভা অন্ধকারকে তরল করিয়া দিয়াছে। উদ্যানের পরেই দ্রুতবহমানা কিস্তা; ক্লান্তি নাই, সুপ্তি নাই, অধীর আগ্রহে প্রপাতের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কস্তুরী কিস্তার পরপারে অগাধ অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। ঐখানে কোথাও এক তাঁবুর মধ্যে তিনি ঘুমাইতেছেন। কেন তিনি একবার আসিলেন না? আসিলে কাজের খুব বেশী ক্ষতি হইত কি?

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ঘরের দিকে ফিরিতেছিল, জানালার নীচে একটা শব্দ শুনিয়া চকিতে নীচের দিকে তাকাইল। যেন চাপা গলায় কে কথা কহিল।

নীচে অন্ধকার; মনে হইল একটা লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাগড়ির জরির উপর ক্ষণেকের জন্য আলো প্রতিফলিত হইল।

রানীজী!

কণ্ঠস্বর অতি নিম্ন, কিন্তু সম্বোধনটা স্পষ্ট কস্তুরীর কানে আসিল। সে গলা বাড়াইয়া বিস্মিতস্বরে বলিল—কে?

নীচ হইতে উত্তর আসিল—আমি রুদ্ররূপ।

রুদ্ররূপ! কস্তুরীর মনে পড়িল, কৃষ্ণার মুখে শুনিয়াছে, রুদ্ররূপ মহারাজের পার্শ্বচর। কি চাও? তাহার গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

পূর্ববৎ চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—রানীজী, মহারাজ এসেছেন, ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন-আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

কস্তুরী জানালা হইতে একটু সরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আসিয়াছেন! কিন্তু এই শেষ রাত্রে কেন? নির্জনে দেখা করিতে চান বলিয়াই কি আজ বিবাহ বাসরে আসেন নাই?

সে আবার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল।

পুনশ্চ স্বর শুনিতে পাইল—রানীজী, দোষ নেবেন না। মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন। বড় জরুরী ব্যাপারে তাঁকে কালই চলে যেতে হবে, তাই একবার–

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুমি দাঁড়াও। কস্তুরীর কথাগুলি শিউলি ফুলের মত অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে একবার ভাবিল, কাহাকেও সঙ্গে লইবে? কিন্তু কৃষ্ণা ছাড়া আর তো কাহাকেও সঙ্গে লওয়া যায় না। অথচ কৃষ্ণাকে এখন ডাকা সম্ভব নয় কিন্তু প্রয়োজন কি? সে একাই যাইবে।

ওড়না গায়ে জড়াইয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিল। কেহ কোথাও নাই; বৃহৎ প্রাসাদের অপরাংশে সকলে তখনও আমোদে মগ্ন। যে কয়জন দাসী রানীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, রানী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার পর তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। লঘু পদে কস্তুরী নীচে নামিয়া গেল।

সেই লোকটি জানালার নীচে অপেক্ষা করিতেছিল, একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। কস্তুরীও তাহার মুখ অস্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই রুদ্ররূপ! সে রুদ্ররূপকে পূর্বে দেখে নাই।

পুরুষ সসম্মানে কহিল—এইদিকে রানীজী, এইদিকে—

তাহার অনুসরণ করিয়া কম্প্রবক্ষে কস্তুরী ঘাটের দিকে চলিল।

.

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

গৌরী আর প্রহ্লাদ মুখোমুখি বসিয়া, তাহাদের মধ্যস্থলে লণ্ঠন। গৌরী স্থিরভাবে বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার নিষ্কম্প দেহটা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটা অনলস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে—যে-কোনো মুহূর্তে বারুদের স্তুপের মত প্রচণ্ড উন্মত্ততায় বিচ্ছুরিত হইয়া চারিদিকে দাবানল ছড়াইয়া দিবে।

কস্তুরী! এই নরকের ক্লেদাক্ত সরীসৃপগুলা কস্তুরীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আনিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনিবার পর ইহাদের গগনস্পর্শী ধৃষ্টতা গৌরীর মনটাকে ক্ষণকালের জন্য অসাড় করিয়া দিয়াছিল; প্রথমটা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যই ইহা তো অসম্ভব নয়। উদিত মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। ভাইকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া যে সিংহাসন গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, তাহার অসাধ্য কি আছে? ঝিন্দের সিংহাসন পাইবার আশা হারাইয়া সে অবশেষে ঝড়োয়ার সিংহাসন দখল করিবার জন্য এই ক্রুর মতলব বাহির করিয়াছে। কস্তুরীকে বলপূর্বক বিবাহ করিবে; হিন্দুর বিবাহ, একবার সম্পাদিত হইলে আর নড়চড় হয় না–তখন ঝড়োয়া রাজ্যের উপর উদিতের দাবি কে অস্বীকার করিবে? Factum Valet... কি নৃশংস স্বার্থপরতা! কি পৈশাচিক রবুদ্ধি! এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ময়ূরবাহন তাহাকে দিয়াছিল।

প্রহ্লাদ কুণ্ঠিতস্বরে মৌনভঙ্গ করিল—ময়ূরবাহনের ফিরতে এখনো বোধ হয় দেরি আছে। ইতিমধ্যে রাজাকে—

গৌরী অগ্নিগর্ভ চোখ তুলিল; কথা কহিল না। প্রহ্লাদ দেখিল, চোখের মধ্যে সর্বগ্রাসী একটি চিন্তাই প্রতিফলিত হইতেছে। রাজার স্থান সেখানে নাই, বোধ করি জগতের আর কিছুরই স্থান নাই।

প্রহ্লাদ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল-ওদিকে দুর্গের সামনে আপনার সিপাহীরা এতক্ষণ নিশ্চয় পৌঁছে গেছে—দুর্গের সিংদরজা খুলে দেবার চেষ্টা করলে হত না? দুজন

শাস্ত্রী পাহারায় আছে, আমি তাদের ভুলিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি। আপনার লোকেরা একবার ঢুকে পড়লে

না, ওসব পরে হবে।

আবার দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। লণ্ঠনের আলোক শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; রাত্রিশেষের শীতল বাতাস জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সহসা প্রহ্লাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; চাপা উত্তেজনায় বলিল—ওরা আসছে দাঁড়ের শব্দ পেয়েছি। আপনি এখন আলোর কাছ থেকে সরে যান। যেমন যেমন ঠিক হয়েছে তেমনি করবেন, যথাসময়ে আমি সঙ্কেত করব—

গৌরীও চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপতিত ছোরাটা তাহার পায়ে ঠেকিল, সেটা ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া লইয়া সে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরের দিকে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রহ্লাদ লণ্ঠন লইয়া গুপ্তদ্বারের মুখের কাছে দাঁড়াইল।

দাঁড়ের মৃদু ছপ ছপ শব্দ, তারপর ময়ূরবাহনের হাসি শোনা গেল। নৌকার মুখ আসিয়া দ্বারের নীচে ঠেকিল।

প্রহ্লাদ, দড়িটা ধর।

ময়ূরবাহন লাফাইয়া প্রহ্লাদের পাশে দাঁড়াইল, নৌকার দিকে ফিরিয়া বলিল—এইবার রানীজীকে তুলে দাও। হুঁশিয়ার স্বরূপদাস, সবসুদ্ধ জলে পড়ে যেও না। আস্তে রানীজী—চঞ্চল হবেন না, কোনো ভয় নেই, আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য–হা হা হা–

ওড়না দিয়া মুখ ও সর্বাঙ্গ দড়ির মত করিয়া বাঁধা একটি বিদ্রোহী নারীমূর্তি ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে নামানো হইল। প্রহ্লাদ ও ময়ূরবাহন দেহটিকে সুড়ঙ্গের মধ্যে আনিয়া একপাশে শোয়াইয়া দিল। তারপর ময়ূরবাহন জলের দিকে ফিরিয়া বলিল–স্বরূপদাস, এবার তোমরা নেমে এস। ডিঙি ভেতরে তুলতে হবে।

স্বরূপদাস নৌকা হইতে কাতরস্বরে বলিল-দাঁড় দুটো জলে পড়ে গিয়ে কোথায় ভেসে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না।

ময়ূরবাহন হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তা যাক; আপাতত আর দাঁড়ের দরকার নেই। প্রহ্লাদ, তুমি আর আমি এবার রানীজীকে—

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ পূর্ব নিরূপিত সমস্ত সঙ্কল্প উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদের সঙ্কেতের অপেক্ষা না করিয়াই দুরন্ত ঝড়ের মত গৌরী অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। কস্তুরীর ঠিক পাশে প্রহ্লাদ দাঁড়াইয়া ছিল, গৌরীর প্রথম ধাক্কাটা তাহাকেই গিয়া লাগিল। প্রহ্লাদ টাউরি খাইয়া ময়ূরবাহনের গায়ে পড়িল। ময়ূরবাহন আচমকা ঠেলা খাইয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে লণ্ঠনটা ডিঙাইয়া

জলের কিনারা পর্যন্ত গিয়া কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ফিরিয়াই নিমেষমধ্যে যেন পাথরে পরিণত হইয়া গেল।

দৃশ্যটা নাটকীয় বটে। মেঝের উপর পীতাভ লণ্ঠন জ্বলিতেছে; তাহার অনতিদূরে প্রহ্লাদ ভূমি হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিয়া নতজানু অবস্থাতেই ময়ূরবাহনের দিকে নিষ্পলক তাকাইয়া আছে; আর তাহার পশ্চাতে ভূলুণ্ঠিত নারী দেহের দুইদিকে পা রাখিয়া একটা নগ্নকায় দৈত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষে জ্বলন্ত অঙ্গার, হাতে একটা ঝকঝকে বাঁকা ছোরা।

ময়ুরবাহনের চক্ষু ক্রমশ কুঞ্চিত হইয়া আলোকের দুইটি বিন্দুতে পরিণত হইল। তারপর সে হাসিল; কোমর হইতে বিদ্যুদ্বেগে অসি বাহির হইয়া আসিল—

আরে! বাংগালী নটুয়া! তুই এখানে?

ময়ূরবাহনের হাসিতে পৈশাচিক উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। সে তরবারি হস্তে একপদ অগ্রসর হইল।

বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিস! হা হা হাবাংগালী নটুয়া। আজ তোকে কে রক্ষা করবে?

প্রহ্লাদ ভয়ার্ত চোখে তাহার দীর্ঘ তরবারির দিকে চাহিয়া রহিল। গৌরীর হাতে কেবল ছোরা, অন্য অস্ত্র নাই।

পিছন হইতে স্বরূপদাসের করুণ স্বর আসিল—দড়ি ছেড়ে দিলেন কেন? নৌকা যে ভেসে যাচ্ছে—

কেহ কর্ণপাত করিল না; ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইল।

প্রহ্লাদ সহসা নতজানু অবস্থা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃতস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—মহারাজ, পালান—

ময়ূরবাহনের সাপের মত চোখ প্রহ্লাদের দিকে ফিরিল—তুই বেইমানি করেছিস! তোকেই আগে শেষ করি।

প্রহ্লাদ তখনও ময়ূরবাহনের তরবারির নাগালের মধ্যে ছিল না, ময়ূরবাহন আর এক পা আগে আসিয়া তরবারি তুলিল।

প্রয়াদের কানের পাশ দিয়া শাঁই করিয়া একটা শব্দ হইল; একটা আলোর রেখা যেন তাহার পিছন হইতে ছুটিয়া গিয়া ময়ূরবাহনের পঞ্জরের নীচে গাঁথিয়া গেল।

ডান হাতে উত্থিত তরবারি, ময়ূরবাহন নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার অধরের রক্তিম হাসি ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তারপর উত্থিত তরবারিটা ঝন্ ঝন্ শব্দে পাথরের মেঝেয় পড়িল।

ময়ূরবাহন কিন্তু পড়িল না। একটা অর্ধচক্রাকৃতি পাক খাইয়া সে নিজেকে খাড়া করিয়া রাখিল। আমূলবিদ্ধ ছোরার মুঠ ধরিয়া সেটাকে নিজের দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল। তাহার মুখ বুকের উপর নত হইয়া পড়িল, চোখে কাচের মত একটা দৃষ্টিহীন স্বচ্ছতার আবরণ পড়িয়া গেল। খলিত পদে গুহ্যদ্বারের কিনারা পর্যন্ত গিয়া যেন অসীম বলে সে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; মাতালের মত দুইবার টলিয়া হঠাৎ কাৎ হইয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

প্রহ্লাদ এতক্ষণ জড়ের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন সচেতন হইয়া ব্যগ্র বিস্ফারিত নেত্রে গৌরীর পানে তাকাইল। গৌরী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, শুধু তাহার হাতে ছোরা নাই।

প্রহ্লাদ ছুটিয়া জলের কিনারায় গিয়া উঁকি মারিল। ময়ূরবাহনের দেহ সেখানে নাই—হয়তো ডুবিয়া গিয়াছে। দাঁড়হীন নৌকাও দুইজন আরোহী লইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। স্থূলকায় স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস সাঁতার জানে না—অন্য লোকটাও–

প্রহ্লাদ, আলো নাও—পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চল।

প্রহ্লাদ ফিরিয়া দেখিল, গৌরী কস্তুরীকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়াছে।

.

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

দুর্গের উপরিভাগে একটি কক্ষ। বোধ হয় অস্ত্রাগার; চারিদিকের দেয়ালে সেকালের প্রাচীন অস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, বল্লুম ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘরটি নিরাভরণ।

এই ঘরের দ্বারের কাছে সেই লণ্ঠন আলো বিকীর্ণ করিতেছে; আর, ঘরের মধ্যস্থলে গৌরী ও কস্তুরী দাঁড়াইয়া আছে।

আলোর পীতাভ অস্পষ্টতায় দুইজনকে পৃথকভাবে দেখা যাইতেছে না। কস্তুরীর দুই বাহু গৌরীর কণ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ, মুখখানি ক্লান্ত মুদিত কুমুদের মত তাহার নগ্ন বক্ষে নামিয়া পড়িয়াছে। গৌরীর বাহুও এমনভাবে কস্তুরীকে বেষ্টন করিয়া আছে যেন সে-বন্ধন ইহজীবনে আর খুলিবে না।

দুইজনেই নীরব; কেবল গৌরী মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ক্ষুধিত স্বরে বলিতেছে—কস্তুরী-কস্তুরী-কস্তুরী–

কস্তুরী সাড়া দিতেছে না। সে কি মূর্ছিতা? অথবা নিজের দুরবগাহ অনুভূতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

রানী! গৌরী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল।

এবার কস্তুরী চোখ খুলিল। ধীরে ধীরে গৌরীর মুখের কাছে মুখ তুলিয়া ধরা-ধরা অস্ফুট স্বরে বলিল—রাজা!

গৌরী মর্মছেঁড়া হাসি হাসিল—রাজা নয়। সব তো বলেছি কস্তুরী, আমি নগণ্য বিদেশী। এবার ছেড়ে দাও, কর্তব্য শেষ করে চলে যাই।

কস্তুরীর হাত দুইটি ক্রমশ শিথিল হইয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িল। সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তেমনি ধীর অচঞ্চল স্বরে বলিল—চলে যাবে?

তাছাড়া আর তো পথ নেই কস্তুরী। তুমি ঝিন্দের বাগদত্তা রানী—

বেশ-যাও। আমারও কিস্তা আছে।

না না না, ওকথা নয় কস্তুরী। আমি মরি ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি—

আমি ঝিন্দের রানী হবার জন্যে বেঁচে থাকব! অতি ক্ষীণ হাসি কস্তুরীর অধরপ্রান্তে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল—তুমি যাও, তোমার কর্তব্য কর গিয়ে, আমার কর্তব্য আমি জানি।

কস্তুরী, ভালবাসার কাছে আমাদের প্রাণ তুচ্ছ, সে আমি জানি। কিন্তু ইচ্ছে করে মরবে কেন? যদি বেঁচে থাকি—দূর থেকে দুজনে দুজনকে ভালবাসব। হলেই বা তুমি ঝিন্দের রানী, তোমার ভালবাসা তো চিরদিন আমার থাকবে–

রাজা, তোমাকে যদি না পাই, আমার কিস্তা আছে।

এই অচঞ্চল উত্তাপহীন দৃঢ়তার সম্মুখে গৌরীর সমস্ত যুক্তি ভাসিয়া গেল; সে যে মিথ্যা যুক্তি দিয়া নিজেকেই ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বেশ, তাই ভাল। আমি চললাম, রাত শেষ হয়ে গেছে, তুমি এখানেই থাক। যদি রাজাকে উদ্ধার করেও বেঁচে থাকি, তোমার কাছে ফিরে আসব। আর যদি না ফিরি, তখন যা-ইচ্ছে কোরো।

কস্তুরী দুই বাহু বাড়াইয়া গৌরীর মুখের পানে চাহিল। আয়ত চোখ দুইটিতে ভালবাসা টলটল করিতেছে; লজ্জা নাই, নিজের মনের নিবিড়তম বাসনা গোপন করিয়া তিলমাত্র খর্ব করিবার চেষ্টা নাই। যে মৃত্যুর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে লজ্জা করিবে কাহাকে?

দুঃসহ যন্ত্রণার আর্তস্বর গৌরীর কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। দুরন্ত আবেগে কস্তুরীর দেহ নিজ বাহুমধ্যে একবার নিষ্পেষিত করিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

.

প্রহ্লাদ, একটা অস্ত্র আমাকে দাও।

প্রহ্লাদ তলোয়ার দিল। সেটা হাতে লইয়া গৌরী হঠাৎ হাসিল, বলিল—চল, এবার উদিতের সঙ্গে দেখা করি; বাংগালী কুত্তার ওপর তার বড় রাগ। প্রহ্লাদ, এই তলোয়ার দিয়ে ঝিন্দের সমস্ত মানুষকে হত্যা করা যায় না? তুমি—আমি—উদিত-ধনঞ্জয়-রুদ্ররূপ-শত্রু-মিত্র কেউ বেঁচে থাকবে না।

প্রহ্লাদ ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চুপ করিয়া রহিল। গৌরী বলিল—রাজার কোত-ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

লণ্ঠন হস্তে প্রহ্লাদ আগে আগে চলিল। কয়েক প্রস্থ অপরিসর সিঁড়ি নামিয়া তাহারা অবশেষে এক গোলকধাঁধার মত স্থানে উপস্থিত হইল; সুড়ঙ্গের মত একটা বদ্ধ সঙ্কীর্ণ গলি বাঁকা হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার একপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার দরজা। গৌরী বুঝিল, এগুলি দুর্গের প্রাচীন কারাকক্ষ, ইহাদেরই গবাক্ষ বাহির হইতে দেখা যায়।

এই গলির একটা বাঁকের মুখে এক বদ্ধ দরজার সম্মুখে প্রহ্লাদ দাঁড়াইল; গৌরীকে একটা চোখের ইঙ্গিত জানাইয়া আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—কে?

আমি প্রহ্লাদ। দরজা খুলুন, ময়ূরবাহন ফিরেছেন।

দরজার জিঞ্জির খোলার শব্দ হইতে লাগিল। গৌরী প্রহ্লাদের কানে কানে বলিল—তুমি যাও—দুর্গের সিংদরজা খোলার ব্যবস্থা কর।

প্রহ্লাদ আলো লইয়া দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল।

উদিত দরজা খুলিয়া দেখিল, গলিতে অন্ধকার। কক্ষের ভিতরে ক্ষীণ আলোকে তাহার চেহারার রেখা দেখা গেল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া উদিত বলিল—প্রহ্লাদ, এ কি! আলো আননি কেন? ময়ূরবাহন ফিরেছে? রানীকে এনেছে?

সে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—প্রহ্লাদ, তুমি কোথায়? রানীকে এনেছে ময়ূরবাহন? তাহার কণ্ঠস্বরে একটা জঘন্য লুব্ধতা প্রকাশ পাইল।

গৌরী তাহার দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তলোয়ারখানা উদিতের বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। উদিতের কণ্ঠ হইতে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইল। আর সে কথা কহিল না, নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

গৌরী তাহার মৃতদেহ লঙ্ঘন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর সিং মলিন শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। মোমবাতির আলোয় দুইজনে পরস্পর মুখের পানে চাহিল। শঙ্কর সিংয়ের দেহটাও উদিতের দেহের মতই নশ্বর, শুধু তলোয়ারের একটা আঘাতের ওয়াস্তা।

তারপর অদ্ভুত হাসিয়া গৌরী বলিল—শঙ্কর সিং, তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

.

রাত্রি আর নাই; পূর্বাকাশে ঊষা ঝলমল করিতেছে।

দুর্গপ্রাকারের পাশে দাঁড়াইয়া দুই শঙ্কর সিং অরুণায়মান কিস্তার পানে তাকাইয়া আছে। প্রাকারের কোলে কোলে তখনও রাত্রির নষ্টাবশেষ অন্ধকার জমা হইয়া আছে।

পাশাপাশি দুই শঙ্কর সিং-চেহারা ও বেশভূষায় কোনো প্রভেদ নাই। দুইজনেই বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছে।

একজন ভাবিতেছে ফুরাইয়া আসিল আমার ঝিন্দের খেলা। ঐ দুর্গের দ্বার খুলিল। ধনঞ্জয় আসিতেছে—আর দেরি নাই।

আর একজন ভাবিতেছে—কি ভাবিতেছে সে নিজেই জানে না। বোধ করি সুসংলগ্ন চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার নাই।

প্রাকার-ক্রোড়ের অন্ধকারে কি একটা নড়িল। কেহ লক্ষ্য করিল না। উভয়ের দৃষ্টি দুর-বিন্যস্ত!

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। পাথরের অঙ্গনে তাহাদের জুতার কঠিন শব্দ শুনা যাইতেছে। প্রহ্লাদের গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিল; সে পথ নির্দেশ করিয়া লইয়া আসিতেছে।

আবার অন্ধকার প্রাকারের ছায়ায় কি নড়িল। দুই শঙ্কর সিং নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া দুইজনেই ফিরিল।

একটি নারীমূর্তি তাহাদের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কস্তুরী! দুই শঙ্কর সিং তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পাংশু নারীমূর্তি অস্ফুট চিৎকার করিয়া তাহাদের কি বলিতে চাহিল। কিন্তু বলিবার পূর্বেই প্রাকারের ছায়াশ্রয় হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। মূর্তিটা টলিতেছে, সর্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, হাতে ছোরা।

ছোরা একজন শঙ্কর সিংয়ের বুকে বিঁধিল—আমূল বিঁধিয়া গেল। শুধু সোনার কাজকরা মুঠ ঊষালোকে ঝিকমিক করিতে লাগিল।

নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ছোরা। এতদিনে বুঝি তাহার কাজ শেষ হইল।

আততায়ী ও আহত একসঙ্গে পড়িয়া গেল। শঙ্কর সিং নিশ্চল; মহরণাহত ময়ূরবাহনের শেষ নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে একটা অস্ফুট হাসির শব্দ বাহির হইয়া আসিল।

বিজয়ী বেপরোয়া বিদ্রোহী ময়ূরবাহন।

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল।

একজন শঙ্কর সিং তখনো স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আছে; আর তাহার অদূরে একটি পাংশু নারীমূর্তি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ধনঞ্জয় ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইলেন। তারপর কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিলেন—রুদ্ররূপ, এখানে আর কাউকে আসতে দিও না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

ঝিন্দ্ রাজপ্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী বিশাল কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে আবলুশের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ঝিন্দের রাজা শঙ্কর সিং পত্র লিখিতেছেন।

চারিদিকের ভোলা জানালার বাহিরে রৌদ্র-প্রফুল্ল প্রভাত; কয়েক দিন আগে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া। গিয়া আকাশ পালিশ করা ইস্পাতের মত ঝকঝক করিতেছে; কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন নাই।

শঙ্কর সিং পত্র লিখিতেছেন বটে, কিন্তু নিবিষ্টমনে পত্র শেষ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। ঘরের দ্বারে রুদ্ররূপ পাহারায় আছে এবং প্রাসাদের সদরে স্বয়ং ধনঞ্জয় বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছেন; তবুও রাজদর্শনপ্রার্থী সম্ভ্রান্ত জনগণের স্রোত ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না। ডাক্তার। গঙ্গানাথের দোহাই পর্যন্ত কেহ মানিতেছে না। শক্তিগড় দুর্গে রাজার প্রতি হিংসুক উদিতের আক্রমণ ও রাজার অসাধারণ বাহুবলে উদিত, ময়ূরবাহন প্রভৃতির মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। উদিত যে রাজাকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, একথা কাহারও অবিদিত নাই। মন্ত্রী বজ্রপাণি ভার্গব ও সর্দার ধনঞ্জয় এই শোচনীয় ভ্রাতৃবিরোধের কাহিনী গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

সত্য কথা চাপিয়া রাখা যায় না, প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তাই গত কয়েকদিন ধরিয়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ক্রমাগত রাজাকে অভিনন্দন জানাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহাদের শুভাগমনের ফাঁকে ফাঁকে পত্র-লিখন চলিতেছে–

—যার হাতে চিঠি পাঠালাম, তার নাম প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত। সে বাঙালী, যদিও তার ভাষা শুনলে সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মাতে পারে। কিন্তু ভাষা যাই হোক, প্রহ্লাদ খাঁটি বাঙালী। গত কয়েক দিন ধরে আমি কেবলই ভাবছি, প্রহ্লাদ যদি বাঙালী না হত? অনেককে বলতে শুনেছি, বাঙালীর ভায়ে ভায়ে মিল নেই, যেখানে দুটি বাঙালী সেখানেই ঝগড়া। মিথ্যে কথা। বিদেশে বাঙালীর মত বাঙালীর বন্ধু আর নেই। যদি সন্দেহ হয়, প্রহ্লাদকে স্মরণ কোরো।

.

রুদ্ররূপ দ্বারের পর্দা ফাঁক করিয়া জানাইল, ঝড়োয়ার বিজয়লালকে সঙ্গে লইয়া ধনঞ্জয় আসিতেছেন। শঙ্কর সিং অসমাপ্ত পত্র সরাইয়া রাখিলেন।

বিজয়লাল মিলিটারি স্যালুট করিয়া একখানি পত্র রাজার হাতে দিল। ঝড়োয়ার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে রাজকীয় লেফাফাদুরস্ত পত্র—দেওয়ান লিখিয়াছেন। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পত্রে চোখ বুলাইয়া শঙ্কর সিং বিজয়লালের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন; গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—রানী কস্তুরীবাঈ ভাল আছেন?

আছেন মহারাজ!

মহারাজের গম্ভীর মুখের এক কোণে একটু হাসি দেখা দিল—আর-কৃষ্ণাবাঈ? তিনি ভাল আছেন?

বিজয়লাল অবিচলিত মুখে কেবল একবার মাথা ঝুঁকাইল।

রাজা ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—সর্দার, সুবাদার বিজয়লালকে আমি আমার খাস পার্শ্বচর নিযুক্ত করতে চাই। এ বিষয়ে ঝড়োয়ার দরবারের সঙ্গে যে লেখাপড়া করা দরকার, তা আজই যেন করা হয়।

যো হুকুম মহারাজ!

রাজা মস্তকের একটি সঙ্কেতে উভয়কে বিদায় দিলেন।

.

-তোমার পায়ে পড়ি অচলবৌদি, দেরি কোরো না। যত শিগগির পারো দাদাকে নিয়ে চলে এস। তোমাদের জন্য যে কি ভয়ঙ্কর মন কেমন করছে তা বলতে পারি না। যদি সম্ভব হত, আমি ছুটে গিয়ে তোমাদের কাছে পড়তাম। কিন্তু এ রাজ্য ছেড়ে বার হবার উপায় নেই, হয়তো ইহজীবনে ছাড়া পাব না। আমি তো ঝিন্দের রাজা নই, ঝিন্দের বন্দী—

.

রুদ্ররূপের ফ্যাকাসে মুখ ক্ষণকালের জন্য পদার ফাঁকে দেখা গেল—ত্রিবিক্রম সিং আসছেন।

কিছুক্ষণ ত্রিবিক্রমের সঙ্গে অভিনন্দনের অভিনয় চলিল। তারপর শঙ্কর সিং সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—ত্রিবিক্রম সিং, আমি আপনার মেয়ে চম্পাদের জন্য পাত্র স্থির করেছি।

ত্রিবিক্রম ঈষৎ চমকিত হইয়া মামুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তারপর দুইবার কাশিয়া পাত্রের নামধাম জানিতে চাহিলেন।

শঙ্কর সিং কহিলেন—ভারি সৎ পাত্র—আমার দেহরক্ষী রুদ্ররূপ। চম্পাও তাকে পছন্দ করে।

ত্রিবিক্রম মনে মনে অতিশয় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। তিনি গলার মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিং যেন লক্ষ্য করেন নাই এমনিভাবে বলিলেন—ময়ূরবাহন মরেছে-তার কেউ ওয়ারিস নেই। আমি স্থির করেছি ময়ূরবাহনের জায়গীর রুদ্ররূপকে বকশিশ দেব।

ত্রিবিক্রমের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি সবিনয়ে রাজার স্তুতিবাচন করিয়া জানাইলেন যে, রাজার অভিরুচির বিরুদ্ধে তাঁহার কোনো কথাই বলিবার ছিল না এবং কোনো কালেই থাকিতে পারে না।

আরো কিছুক্ষণ সদালাপের পর তিনি বিদায় লইলেন।

.

–রাজকার্যে ভয়ানক ব্যস্ত আছি। ঘটকালি করছি। এইমাত্র একটি মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললাম। পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু মেয়ের বাপ বেঁকে বসেছিল। যাহোক, অনেক কষ্টে তাকে রাজী করেছি। প্রণয়ী-যুগলের মিলনে বাধা আর নেই।

বৌদি, বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে?—যে, তুমি যা চাও—অর্থাৎ বৌ-তাই এবার একটা ধরে নিয়ে আসব? একটি বৌ জোগাড় হয়েছে। আমাদের

বংশে বেমানান হবে না; তোমারও বোধ হয় পছন্দ হবে। কিন্তু তুমি তাকে বরণ করে ঘরে না তুললে যে কিছুই হবে না বৌদি! তুমি এস এস এস। তোমরা না এলে কিছু ভাল লাগছে না। তার নাম কস্তুরী। নামটি ভাল, নয়? মানুষটিকে বোধ হয় আরো ভালো লাগবে। সে একটা দেশের রাজকন্যা; কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। যদি চিঠিতেই কৌতূহল মিটে যায়, তাহলে হয়তো তুমি আসবে না।

.

এত্তালা না দিয়াই চম্পা প্রবেশ করিল।

রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—কি চম্পাদেই?

চম্পা রাজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—আজকাল কিছু না খেয়েই দরবার করতে চলে আসছেন? আপনাকে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

খাওয়া হয়নি। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম।

আপনি ভুলে যান, কিন্তু আমাকে যে ছটফট করে বেড়াতে হয়। রুদ্ররূপেরও কি একটু আক্কেল নেই, মনে করিয়ে দিতে পারে না?

হাঁ, ভাল কথা। চম্পা, তোমার বাবা এসেছিলেন; রুদ্ররূপকে তুমি বিয়ে করতে চাও শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে মত দিয়ে গেছেন।

চম্পার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গিয়া হাত নাড়িয়া যেন কথাটাকে দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—ওসব বাজে কথা শোনবার, আমার সময় নেই। আপনার জন্য কি নিয়ে আসব বলুন। দুটো আনারসের মোরব্বা আর একপাত্র গরম সরবৎ–

রাজা চিঠিতে মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন—দরকার নেই।

চম্পা বলিল–তাহলে এক বাটি গরম দুধ—

বিরক্ত কোরো না চম্পা, আমি এখন ভারি জরুরী চিঠি লিখছি।

কিন্তু কিছু তো খাওয়া দরকার। একেবারে—

রাজা হাঁকিলেন—রুদ্ররূপ!

রুদ্ররূপ শঙ্কিত মুখে প্রবেশ করিল।

চম্পার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা হুকুম করিলেন—তুমি চম্পাদেঈর হাত ধর।

রুদ্ররূপ কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর ফাঁসির আসামীর মত মুখের ভাব করিয়া চম্পার একটি হাত ধরিল।

রাজা বলিলেন—বেশ শক্ত করে ধরেছ? আচ্ছা, এবার ওকে নিয়ে যাও।

ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ররূপ বলিল—কোথায় নিয়ে যাব?

তোমার বাড়িতে। না না, এখন থাক, সেটা বিয়ের পরে হবে। আপাতত তুমি ওকে ওর মহালে নিয়ে যাও। সেখানে ওকে আটক রাখবে, যতক্ষণ তোমার কথা না শোনে ওর হাত ছাড়বে না—যাও।

কড়া হুকুম দিয়া রাজা পুনরায় চিঠিতে মন দিলেন। চম্পা ও রুদ্ররূপ আরক্তমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আড়চোখে পরস্পরের পানে চাহিল। দুইজনেরই ঠোঁটের কুলে কুলে হাসি ভরিয়া উঠিল। রাজা তখন চিঠিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন; পা টিপিয়া টিপিয়া উভয়ে দ্বারের দিকে চলিল।

পদার ওপারে গিয়াই চম্পা সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর রুদ্ররূপের বুকে একটা আচমকা কিল মারিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

.

—ঝিন্দের মহারাজ শঙ্কর সিং বিদেশীদের খুব খাতির করেন। তোমরা এলে রাজপ্রাসাদেই অতিথি সঙ্কারের ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া রাজকীয় প্রকাণ্ড যাদুঘরের ভার নেবার জন্য একজন পণ্ডিত লোকের দরকার; দাদা ছাড়া আর তো যোগ্য লোক দেখি না।

এত কথা লেখবার আছে যে কিছুই লেখা হচ্ছে না। তোমরা কবে আসবে?

দাদাকে বোলো, তাঁর দেওয়া ছোরাটা কিস্তার জলে ভেসে গেছে; ছোরার ন্যায্য অধিকারী সেটা বুকে করে নিয়ে গেছে। দুঃখ করবার কিছু নেই।

ভাল কথা, গৌরীশঙ্কর রায় নামক একজন বাঙালী যুবক ঝিন্দে বেড়াতে এসেছিল, সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে।

কবে আসবে? প্রণাম নিও। ইতি—

দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ
শঙ্কর সিং
32